ভিতালি বিআংকি

হঠাৎ দেখা

মিতালি বিতাংকি

হঠাৎ দেখা

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

ভিতালি বিআংকি

হঠাৎ দেখা

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: শুভময় ঘোষ
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: গ. নিকোলস্কি
চিত্রাঙ্কন: ব. কুদরোভ

সূচী

ভূমিকা

পৃষ্ঠা

ছোট্ট জলদৈত্য ৯

খোলামেলার রাজ্য

ভোলোভ খুড়োর নেকড়ে শিকার ১৭

ঝুড়ির মধ্যে কান ২৮

রঙিন রাত্রি ৩৬

সুন্দর হৃদ সারীকুল ৪৫

জুলবার্স ৫৬

সোনালী গাংচিন ৬২

কুবান্ পাহাড়ে ৭২

মেঠো ইঁদুর ৮৩

রাতের বনের গোপন কথা ৮৯

খরগোসের ন্যাজে নুন দেওয়া ৯৫

ভাববার কথা

ফিকে গোলাপী আর জলপাই সবুজ ১০৫
দুই বসন্ত ১০৯
রাত্রে যারা লুকিয়ে আসে ১১৬
ও, আউলেই, আউলেই, আউলেই ... ১২৫

নিঃশব্দের কথা

উম্‌নুম্‌! ১৩১
"সে" ... ১৪৭
বোবা পাখি ১৬০

পরিশিষ্ট

গাংচিল ১৬৯

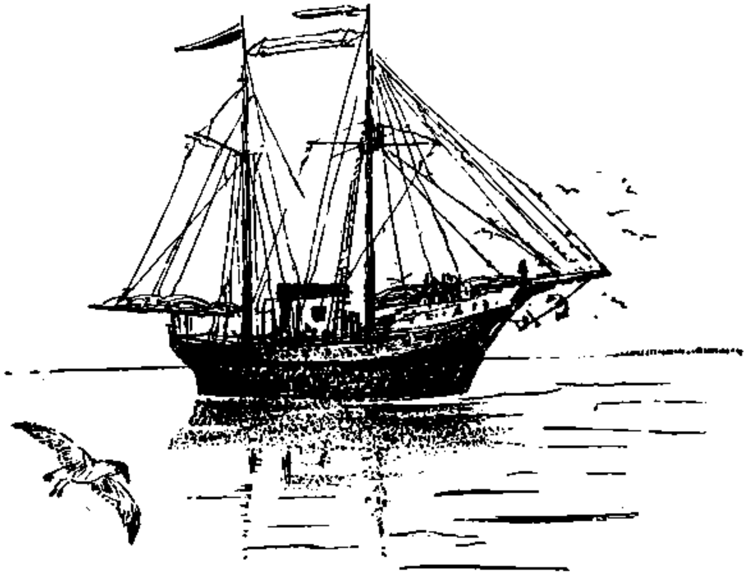

ভূমিকা

ছোট্ট জলদৈত্য

হাওয়ার মুখে

এখনও আমি অবাক হয়ে ভাবি এরকম একটা বিপজ্জনক অভিযানে আমি একলা কী সাহসে গিয়েছিলাম।

সমুদ্র সাদা টুপী পরে নাচছিল। দড়ি খোলামাত্রই ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকোটা আবার তীরে ফিরে ফিরে এল। কোন রকমে দাঁড়গুলো বাইবার জায়গায় লাগিয়ে সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়ে নিলাম, তখন সুরু হল লড়াই।

সাগর আর হাওয়া এই দুই শক্তি যেন কিছুতেই আমায় লক্ষ্যে পৌঁছতে দেবে না, আমায় শেষ করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টানতে সুরু করলাম; ঢেউগুলো আমার হাত থেকে দাঁড় টেনে ছিঁড়ে কেড়ে নিতে লাগল, আর বাতাস দুদিক থেকে পালা করে তেড়ে এসে নৌকোটাকে পিছনে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, চাইল নৌকোটাকে একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে ডুবিয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পরেই আমার হাত ছড়ে গেল, কিন্তু নৌকোটাকে ঠিক পথে রাখার চেষ্টায় আমি তখন এত মগ্ন যে হাতের ব্যথা অনুভব করতে পারলাম না।

বন্ধুদের এক আধজনকে না আনায় দুঃখ হল। কাউকে যদি হালটা ধরিয়ে বসিয়ে দিতে পারতাম, তবে কেবল দাঁড়টা নিয়ে আমায় ভাবতে হত। একা আমায় ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা দেখবার জন্য দুদিকেই নজর রাখতে হচ্ছিল।

সমুদ্রের মাঝখানে যে পাঁচটা পাহাড় একসঙ্গে আছে, তার নাম দিয়েছি পাঁচ ভাই—সেই দুর্গম নিষিদ্ধ জায়গাতেই আমার যাবার ইচ্ছা। তীর থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

হ্যাঁ, খুব বেশি দূরে নয়, তবে তুলনায় —তার মানে, যখন আবহাওয়া বেশ ভাল, তখন বেশি দূরে নয়—কিন্তু সেই সময় সেই দূরত্বই মনে হচ্ছিল কী ভীষণ।

প্রবল হাওয়া সত্ত্বেও আমি থামছিলাম। হঠাৎ সব কিছু বেশ সহজ হয়ে গেল—নৌকোটা একটা পাক খেয়ে পাঁচ ভাইয়ের তলে গিয়ে দাঁড়াল, দুলুনি থামল।

কিন্তু পাহাড়ের এই দিকে নামা অসম্ভব। পশ্চিম দিক ঘুরে বড়ভাই দুজনের, তার মানে সবচেয়ে বড় পাহাড় দুটোর মাঝের পথ দিয়ে নৌকোটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হল। পথটা আমার জানা ছিল, কারণ পাঁচ ভাইয়ে আমি আগে আরও দুবার এসেছি। জানতাম যে পথটা সত্যিই খুবই বিপজ্জনক—ঢেউগুলো পাহাড়ের গায়ে এমন জোর আছড়ে পড়ে যে তাতে যে কোন নৌকো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।

যাত্রার শেষ পাল্লাটার আগে—সেটাই সবচেয়ে ভীষণ পাল্লা—দাঁড়ে ভর দিয়ে জিরতে জিরতে সমুদ্রটা একবার ভাল করে দেখে নিলাম। কোথাও জনপ্রাণী নেই; এমন হাওয়ার মধ্যে এই অকালে পাড়ি দেবার মত দুঃসাহস আর কোন পাগলের হবে?

শেষকালে মাঝখানের পথ দিয়ে নৌকোটাকে তো সাহসে ভর করে চালিয়ে দিলাম।

প্রবল স্রোত পথ জুড়ে দাঁড়াল—মনে হল যেন পিছন থেকে কে টানছে।

মুখ ঘোরাবার সময় নেই, আড়চোখে একটু দেখেই আশ্বস্ত হলাম: নৌকোটা আস্তে আস্তে এগোতে স্থরু করেছে।

প্রচণ্ড উৎসাহে আরো জোর টানতে লাগলাম, তারপর হঠাৎ দেখি কখন পথটার অপর পারে পৌঁছে গেছি।

নৌকোটাকে জোর করে বড় ছোট দুটো ভাইয়ের মাঝখানের একটা সংকীর্ণ গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত করলাম।

সে জায়গাটা বেশ চুপচাপ। দাঁড়গুলোকে নৌকোর খোলে রেখে দিলাম। গলুইয়ের দিকে গিয়ে আমার চারকাঁটাওয়ালা নোঙরটা তুলে নিয়ে বড় ভাইয়ের উপরে ছুঁড়ে মারলাম। দড়িটায় একটু টান দিলাম—নিরাপদে নোঙর ফেলা গেল।

আসতে পেরেছি।

এবার চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে যার জন্য আসা সে কাজে লেগে যাওয়া যেতে পারে।

জলের তল থেকে

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মাছ ধরার সব সরঞ্জাম ছড়িয়ে বসলাম, বঁড়শীতে একগাদ পোকা গাঁথলাম। যে সব চুনোপুঁটি একটা পোকা দিয়েই ধরা যায় তাদের প্রতি আমার নজর নেই: জীবন বিপন্ন করে চুনোপুঁটি ধরতে ত আর আসিনি।

ছিপ ফেললাম। শুকন ঘাসের ফাৎনা ডুবে গিয়ে আবার ফিরে এসে চুপচাপ দাঁড়াল। তারপর নদীর তীর, আকাশ, নৌকো কিছুই আমার মনে রইল না—কেবল ঐ ঘাসটুকু আর তার চারপাশের ছোট্ট জলের বৃত্তটা ছাড়া।

কী সুন্দর সব মাছ আমার বঁড়শীতে ধরা পড়বে, সেই স্বপ্নই দেখতে লাগলাম। এ ত তীরের কাছের হাঁটু জলে মাছ ধরা নয়, একেবারে খোদ সমুদ্রে এসে গেছি, পাহাড়ের কাছে। এই সমুদ্রের গভীরতার খবর কি কেউ জেনেছে? তার গোপন কথা কেউ পড়েছে? কী অদ্ভুত অদ্ভুত বিরাট বিরাট মাছ সেখানে আছে, তাদের কি কেউ কখনও আবিষ্কার করেছে? এমনও হতে পারে, একটা মাছ ধরলাম যার কোনও নামই নেই, কারণ ওরকম মাছ আগে কেউ কখনও ধরেইনি। ঐ পাথরের নিচে হয়ত একটা পুরো ঝাঁক মাছ লুকিয়ে আছে, সবকটাই হয়ত আজ আমার টোপে আটকাবে। তবে ত, সেগুলোকে টেনে বের করার সময়ই পাব না! তবে নৌকোভর্তি মাছ বাড়ি নিয়ে যাব।

ঘাসটুকু তখনও শান্তভাবে জলের উপর ভাসছিল।

সুতোটাকে অনুসরণ করে কালো জলের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম সাগর আর মহাসাগর কত গভীর হতে পারে। তলে মাইলের পর মাইল অজানা জল!

আর তার উপরে মানুষের মত একটা ছোট্ট জীব তার বাদামের খোলার মত নৌকোয়। নিচে অতল সমুদ্র, উপরে অসীম আকাশ...

ফাৎনা থেকে চোখ ফিরিয়ে উপরে তাকালাম, দেখলাম ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে একটুকরো নীল আকাশ। ভাবলাম, 'সময় আসবে, যখন মানুষ অনেক নিচে সমুদ্রের তলের মাটিতে পেঁছিবে, উড়ে যাবে চাঁদের দেশে, গ্রহগ্রহান্তরে, একেবারে সবচেয়ে দূরের তারাটির কাছে।'

চমকে আবার ফাৎনার দিকে তাকালাম। সত্যিই নড়ল, নাকি আমার কল্পনা?

অতল সমুদ্র, অনন্ত আকাশে আর উৎসাহ রইল না : চোখদুটো ফাৎনার উপর স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু ফাৎনা একেবারে নিশ্চল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ছিপটাকে একটু সরালাম, পাহাড়টা থেকে কিছু দূরে। ওখানেই বোধ হয় ভাল হবে।

হঠাৎ ফাৎনা খাড়া হয়ে উঠেই জলের নিচে চলে গেল।

একটা ভীষণ শক্তি নিচে টেনে নিয়ে চলেছে, সুতোটা টান-টান হয়ে উঠেছে, ছিপের ডগাটা বেঁকে গেছে।

অন্যদিকটা আমি জোরে ধরে রেখেছি। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সুতোটা জোরসে টানলাম। একটুও নড়ল না।

আরও জোর টানলাম, টানের চোটে হাত কাঁপছিল।

একটুখানি নড়ল, আর আমি টেনেই চললাম, টেনেই চললাম।

আমার ঘাসের ফাৎনা উপরে উঠল, খাড়া হয়ে দাঁড়াল, আমার দিকে এগিয়ে এল।

তারপর সেটা মড়ার মত চুপ করে রইল। এক ভীষণ টান মারলাম। সেটা এগিয়ে এল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার টান দিল। আমিও আমার সবশক্তি দিয়ে আবার টান দিলাম।

সুতোর ডগায় ঝুলছে একটা মাছ। না না, মোটেই মাছ নয়, একটা সত্যিকার দৈত্য: মাথাটা ছাড়া সারা গায়ে কাঁটা কাঁটা গোটা, হাঁ করা ভীষণ চোয়াল, আর পেছনে মেলে দেওয়া থাবার মত ডানা। তার ল্যাজেও কাঁটার মত গোটা গোটা কী সব, আর যেখানে তার পিঠ থাকার কথা প্রায় সেখান থেকেই ল্যাজ সুরু হয়ে গেছে।

সূর্যের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠে, দৈত্যটা একবার বাতাসে লাফ মেরে, আমার নৌকোর পাটাতনে এসে পড়ল।

কেমন — ধরেছি ত! বিজয়গর্বে তীরের দিকে তাকালাম — ভাগ্যিস তাকিয়েছিলাম। তীরের দিক থেকে যে বিপদ দেখা দিল, তাতে দৈত্যের কথা ভুলে গেলাম।

পাঁচ ভাইয়ের ঠিক উল্টো দিকের তীরে একটা ভীষণ ঘন পাইন বন। ডান দিকে প্রায় আধমাইল দূরে বনের শেষ। তার ওপারে একটা কুঁড়েঘর। সেই কুঁড়েঘর থেকে ফিকে

খয়েরী রঙের টুইডের পোষাক পরা একজন লোক বেরিয়ে এল, তার কাঁধে রাইফেল্ ঝুলছে।

লোকটা বনের দিকে যাচ্ছিল, একবার সেখানে পৌঁছুলে অবশ্য আমায় আর দেখতে পাবে না। কিন্তু আমি তীরে ফেরার আগেই যদি লোকটা বেরিয়ে এসে আমায় দেখে ফেলে, তবেই মরেছি।

প্রত্যেকটি সেকেণ্ড তখন মহামূল্য। দৈত্যটা তখন নৌকোর পাটাতনে দাপাদাপি করছে, সেদিকে কোনও নজর না দিয়ে, পাহাড়ে লাফ দিয়ে পড়লাম, তাড়াতাড়ি নোঙরটা খুলে নৌকোয় লাফিয়ে উঠে দাঁড় তুলে নিলাম।

হাওয়ার মুখে দাঁড় বাওয়া সোজা—ঢেউগুলোই যেন আমাকে তীরের দিকে বয়ে নিয়ে গেল। দুয়েকমিনিটেই ঘাটে পৌঁছে গেলাম।

নৌকোটাকে বেঁধে, ছিপটা তুলে নিয়ে, ঘাটের পথে তীরের দিকে দৌড়তে লাগলাম। যেটাকে ধরেছি, তাকে আর বঁড়শী থেকে খোলার সময় হল না—সুতোর ডগায় সেটা ঝুলতে থাকল।

স্বপ্ন ও সত্য

ফিকে খয়েরী রঙের টুইডের জামা পরা, রাইফেল ঝোলান লোকটি যখন বন থেকে বেরিয়ে এল, আমি ঠিক তখনই কোনরকমে ডাঙায় লাফ দিয়ে পড়েছি। লোকটি আমার বাবা।

বাবা ভীষণ কড়া লোক। যদি দেখতেন পাঁচ ভাইয়ে গেছি—তাও আবার এই হাওয়ায়—তবে পুরো একটি বছর আর নৌকোর মুখ দেখতে হত না।

আমার মাত্র দশ বছর বয়স, একা নৌকো নিয়ে বেরতে বাবা একেবারে বারণ করে দিয়েছেন।

কিন্তু আমি ততক্ষণে তীরে পৌঁছে গেছি। বাবা নিশ্চয়ই ভাববেন আমি তীরে বসেই মাছ ধরছিলাম। সত্যিই আমার ভাগ্যটা সেদিন খুব ভাল ছিল। অবশ্য যদি জিজ্ঞেস করতেন তবে ওরকম ডাহা মিথ্যে কথা বলতে পারতাম না, কিন্তু বাবার প্রশ্নটা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলাম।

আগেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বাবা! দেখ। একটা জলদৈত্য ধরেছি!'

—যত বাজে কথা!—বাবা বললেন, কিন্তু আমার ধরা জিনিসটার দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকালেন, সেটা তখনও সুতোর ডগায় ঝুলছে। বাবা প্রকৃতিকে ভালবাসতেন, তাকে জানার তাঁর সত্যিকার উৎসাহ ছিল।

সুতোটা হাতে নিয়ে বাবা বললেন, 'এরকম মাছ বড় একটা দেখা যায় না, জানিস। একে বলে ষণ্ডমুণ্ড, পাথরের নিচে থাকে, অল্পজলের মাছের মধ্যে এমাছ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভীষণ খায়। ছোট ছোট মাছ, পোকা মাকড়ও ছাড়ে না। লাফ দিয়ে পড়ে গিলে ফেলে।'

আমি শুনে খুব পুলকিত হলাম। বাবা তবে আমায় পাঁচ ভাইয়ের কাছে দেখেননি। অবশ্য পরে কোনও সময়, যখন বড় হব, তখন ব্যাপারটা বলব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ত বীরপুরুষ।

আর জলদৈত্যটা না পেয়ে না হয় একটা ছোট বাচচা জলদৈত্যই ধরেছি, আমার হাতের তেলোর সমান। তাও ত বাবা বললেন অসাধারণ মাছ!

আর পাঁচ ভাইরা উঁচু পাহাড় না হয় নাই হল, এমনি সাধারণ পাঁচটা ছোট পাথর শুধু, তীর থেকে শ'খানেক ফুট দূরে, যেখানে জল মোটেই গভীর নয় তাতেও বা কী এসে যায়?

সত্যিই ত জীবন বিপন্ন করে ওখানে, একা, নৌকো করে গিয়েছিলাম, এই হাওয়ায়। এই গোটা গোটা ফুস্কুড়িতে ভরা ডানা, কাঁটাওয়ালা ল্যাজ, অসাধারণ মাছটা ধরেছি।

বাবা এক্ষুনি শিকারে বেরিয়ে পড়বেন, আমি দৌড়ে বাড়ি গিয়ে মাকে আর বন্ধুদের সবাইকে আমার এই মাছ ধরার কথা বলব। আর চারদিকে—'এ্যাঁ? তাই নাকি? সত্যি?' এসবের ছড়াছড়ি পড়ে যাবে। এমনকি কোনও বন্ধুর কানে কানে একথাও বলতে পারি যে জীবন বিপন্ন করে জন্তুটা ধরেছি।

যাই হোক—উপরে অসীম আকাশ আর নিচে অতল সাগর, মহাসাগর আর চারদিকের এই বিরাট জগৎ কত অনাবিষ্কৃত গোপন রহস্যেই না পূর্ণ। সারা জীবন আমি সেই সবই আবিষ্কার করে বেড়াব, পৃথিবীতে এর মত আনন্দের আর কিছুই নেই।

খোলামেলার রাজ্য

ভোলোভ খুড়োর নেকড়ে শিকার

(গ্রামের একটি ইস্কুলের ছেলের বলা)

দাঁড়ান, সময়টা মনে করি। হ্যাঁ, ঠিক গ্রীষ্মের ছুটির আগেটায়। শিক্ষিকা প্রতিবেদন না কী একটা দিয়ে আমাকে গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতির কাছে পাঠিয়েছিলেন।

আমি সেটা পেঁাছে দিয়ে ঘর থেকে বেরতে যাব এমন সময় রঙিন চশমা পরা, বেঁটে খাট এক বুড়ো ঢুকলেন। খুব মজার দেখতে লোকটি — তার সব কিছুতেই কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কাঁধে তাঁর দোনলা বন্দুকটা ঝোলান, কিন্তু সাধারণত শিকারীরা যেমন নলটা উপরে কুঁদোটা নিচের দিকে করে ঝোলায় সেরকম নয়, এর নলটাই মাটির দিকে। ওরকম বন্দুকও কখনও দেখিনি: ঘোড়া নেই। লম্বা বুটের বদলে পায়ে ফুটোওয়ালা স্যাণ্ডেল, কাঁধের থলেটা পেটের কাছে ঝুলছে, টুপীর সামনের কানাৎটা মাথার পিছনে ঘোরান।

বুড়ো এসে সভাপতিকে নমস্কার করে ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কী খুঁজতে লাগলেন। ঝোলাটা বুকের কাছে বেঁধে রাখায় সুবিধাই হল, আর খুলতে হল না — শুধু মুখটা আল্‌গা করে যা দরকার বের করে নিলেন।

ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট বই বের করে, তার থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে সভাপতির হাতে দিলেন। সভাপতি জোরে পড়লেন: 'কম্‌রেড্ তিত্ ভোলোভ্, নেকড়ে বধনিমিত্ত আঞ্চলিক শিকার শিক্ষক।'

—আপনি কি আঞ্চলিক নির্বাহী সমিতিকে আপনাদের এখানে নেকড়ের উৎপাতের কথা লিখেছিলেন?— তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

—নিশ্চয়ই,— সভাপতি উত্তর দিলেন,— নেকড়ে ত রয়েছে, যদিও কোথা থেকে যে আসে তা বলতে পারব না, অনেক বছর তাদের টিকিও দেখা যায়নি। বেশির ভাগই

বিস্‌ত্র্যান্‌কা নদীর কাছাকাছি থাকে, আর আমাদের জঙ্গলগুলোও যেমন বড় তেমনি ঘন — কী করে সন্ধান করবেন?

— কায়দা জানা চাই,— ভদ্রলোক বললেন।— বাচচাগুলোকে ধরার আর তাদের মাদের গুলী করে মারার এই হল ঠিক সময়। সরকার মাথা পিছু অনেক টাকাও দেয়। শেষ কোনখানে নেকড়ে এসে গোরু মেরেছিল?

— বিস্‌ত্র্যান্‌কার একেবারে কাছেই। তিনদিন আগে উস্তরেকা গ্রামে একটা ভেড়া মেরেছে। গতকাল ইস্‌তোক থেকে একটা কুকুর ধরে নিয়ে গেছে।

দেয়ালে আমাদের অঞ্চলের একটা ম্যাপ্‌ টাঙানো ছিল, ভদ্রলোক সেখানে উঠে গেলেন। ম্যাপে যৌথখামার, মাঠ, বন, গ্রামগুলো সব দেখান ছিল।

ভেবেছিলাম ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ভাল করে দেখার জন্যই চশমা পরেছেন, কিন্তু তা মোটেই নয়! চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে, ভুরু কুঁচকে, নাকটা প্রায় ম্যাপের গায়ে ঠেকিয়ে ম্যাপটা দেখতে লাগলেন।

—এই ইস্‌তোক, এখানে উস্তরেকা। আচ্ছা, 'ক্রাস্নি পাখার'এ কোনও নেকড়ে আছে কি?— জিজ্ঞেস করলেন।

—না, নেই।

—ভাল। তবে সেখান থেকেই সুরু করব, একেবারে এই লুগভায়া গ্রামে,— বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললেন।

— কিন্তু লুগভায়া ত 'ক্রাস্নি পাখার' জেলায়। সেখানে আপনি কী করতে চান?

— কী করতে চাই!— ভদ্রলোক চটে গিয়ে আওড়ালেন।— আমার ধারণা ওখানে বেশ পরিষ্কার লিখে দেওয়া আছে: 'নেকড়ে মারতে'। আপনি কি মনে করেন আমি এখানে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এসেছি? এখন এই নেকড়েগুলোই আমায় ব্যস্ত রাখবে। শুধু যে আপনার এখানেই নেকড়ের উৎপাত যুদ্ধের পর থেকে সুরু হয়েছে তা নয়, যুদ্ধেতেই নেকড়েদের সুবিধা হয়,— দেখুন না সবখানে কী পরিমাণে নেকড়ের সংখ্যা বেড়েছে।

— সে ত বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল। কিন্তু যেখানে নেকড়ের উৎপাত সেখানে না গিয়ে, আপনি একেবারে অন্য জায়গায় যাচ্ছেন কেন সেটাই বুঝতে পারছি না!

— আপনি আমার নামটা ভাল করে পড়েননি, মালুম হচ্ছে। কষ্ট করে আরেকবার দেখুন।

সভাপতি কাগজটার দিকে তাকিয়ে পড়লেন: 'তিত্ ভোলোত্,—আগেও ত তাই পড়েছি।'

—এবার উল্টো দিক থেকে পড়ুন।

সভাপতি অবাক হয়ে বললেন, 'উল্টো দিক থেকেও ত তিত্ ভোলোত্ *।'

ভদ্রলোক রহস্যজনকভাবে বললেন, 'সেই ত। তাহলে উল্টো দিক থেকে একেক সময় বেশি ভাল ফল হয়।'

—সে আপনি বুঝবেন, আপনি ভান্যুশার সঙ্গে যেতে পারেন। ছেলেটি লুগভায়া থেকেই আসছে।—সভাপতি আমার দিকে মাথা নেড়ে বললেন।

বুড়ো লোকটি সভাপতির কাছ থেকে বিদায় নিলে পর আমরা দুজনে চলতে লাগলাম।

প্রথম প্রথম আমার খুব ভয় করছিল, ভদ্রলোক এত গম্ভীর। আমি চুপ করে রইলাম, তিনিও।

গ্রামের প্রান্ত যখন পার হয়ে যাচ্ছি ভোলোত্ খুড়ো একবার আকাশের দিকে তাকালেন, আকাশ তখন মেঘে অন্ধকার। তারপর চলার গতি একটুও না থামিয়ে চশমাটা খুলে নিয়ে ঝোলায় পুরে ফেললেন।

বললেন, 'রোদের ঝাঁঝ থেকে চোখটা বাঁচাবার জন্যই আমি চশমা পরি।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম চশমা ছাড়া তাঁর মুখ যতদূর সদয় হতে পারে তাই। তারপর গল্প বলতে সুরু করলেন।

প্রথমে সবকটাই ছিল নেকড়ের গল্প। যৌথখামার আর সরকারী সম্পত্তির কী পরিমাণ ক্ষতি তারা করেছে। প্রতি বছর আমাদের দেশে কত লক্ষ গোরু ভেড়া নেকড়ের হাতে মারা যায়, তার ফলে কত লক্ষ লক্ষ রুব্‌ল্ ক্ষতি হয়। বললেন, কেবল পাগলা নেকড়েই মানুষ আক্রমণ করে। আহত নেকড়েও মানুষকে আক্রমণ করতে পারে, সাধারণত তা করে না কারণ মানুষকে ভয় পায়। লোকে নেকড়ে সম্বন্ধে গল্প বানায়, যেখানেই যাও সেই একই গল্প শুনবে, কেবল ভাষাটা আলাদা।

বলবে, 'আমাদের যৌথখামারে অবশ্য হয়নি, কিন্তু আরেকটা গ্রামে এই কিছু দূরেই, একটি শিক্ষিকা জেলা সহরের দিকে চলেছে—ঘটনাটা একেবারে সত্যি!—নেকড়ের

---

* রুশ ভাষায় এই নামটি দুদিক থেকেই একইভাবে পড়া যায়।

পাল তাকে ধরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। পরদিন সকালে চাষীরা রাস্তায় কেবল তার জুতোর গোড়ালি আর মাথার রুমালটা খুঁজে পেল—ঐটুকুই তার অবশিষ্ট ছিল।'

শুনে খুব হাসলাম। সত্যিই আমাদের গ্রামেও এরকম গল্প শোনা যায়।

তারপর ত সেই বুড়ো ভদ্রলোক একটার পর একটা গল্প বলেই চললেন, সব রকমের জন্তুর কথা, কী করে তাদের শিকার করতে হয় আর শিকারীদের সব গুলগপ্প। তার একেকটায় ত হেসে মরি আরকি।

কখন যে লুগভায়ায় পৌঁছে গেলাম বুঝতেই পারলাম না।

—আচ্ছা, খোকা,—ভোলোত্ খুড়ো বললেন,—তোমার বাড়িতে আজ রাতটা কাটালে কেমন হয়?

আমি দৌড়ে মাকে গিয়ে তাঁর কথা সব বললাম। মা তাঁকে থাকতে বললেন, আর রাত্রে খাবার জন্য এক ভাঁড় দুধ দিলেন।

সকালবেলা ভোলোভ খুড়ো বললেন:

—ভান্যুশা, আমায় তোমাদের রাখালদের কাছে নিয়ে চল ত। ওরা সবসময় নেকড়ের সন্ধান রাখে।

বিস্ত্র্যান্কার তীর ধরে তাঁকে নিয়ে এগলাম, নদীর পিছন পিছন এসে পড়লাম বনে, বসন্তকালে গোরু চরাবার জায়গায়।

আমাদের রাখাল, মাকার দাদু, একটা গাছের গোড়ায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। ফেদ্কা, রাখাল ছেলে সে, গোরুগুলো একজায়গায় জড় করছিল, আমাদের দেখেই সে দৌড়ে এগিয়ে এল।

মাকার দাদু কানে কম শোনে। ভোলোভ খুড়ো কী জানতে চায় সেটা বুঝতেই তার অনেক সময় লেগে গেল। শেষ কালে বহুকষ্টে বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে বলল: 'আরে বাপু, কীসব বাজে বকছ? ভগবানের কৃপায় জার্মান যুদ্ধের পর থেকে আমাদের এখানে আর নেকড়ে দেখা যায় না। ইস্তোক বা উস্তরেকায় যাও। শুনেছি ওসব অঞ্চলে নেকড়ে আছে।'

ফেদ্কা বলল:

—আমি একটা নেকড়েকে দুবার দেখেছি। একবার সকালে, আরেকবার সন্ধ্যাবেলা যখন গোরুর পাল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। নদীটার ঐপারে, ঐ ছোট্ট টিলাটার উপরে।

তবে ওটা মোটেই নেকড়ে নয়—একটা কুকুর। ঘিয়ে ভাজা, লোম-ওঠা কুকুর। একবার ছড়ি ঘোরাতেই—দৌড় মারল। প্রথমে ভেবেছিলাম—নেকড়ে। কিন্তু আসলে ওটা একটা ভীতু কুকুর, বোধ হয় কারো বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

ভোলোত্ খুড়ো হেসে বললেন, 'আচ্ছা, বীরপুরুষ, তোমার কুকুরটার কানদুটো আর ল্যাজটা খাড়া ছিল কিনা দেখেছিলে?'

ফেদ্‌কা বলল: 'কানদুটো ঠিক খাড়া ছিল, কিন্তু ল্যাজটা ভয়ে পিছনের দুপায়ের মধ্যে কাঠির মত গুঁজে দিয়েছিল।'

—সকালবেলা কুকুরটা কোন দিকে গিয়েছিল?

—ঐ দিকে,—বলে ফেদ্‌কা নদীর পারের বন দেখিয়ে ছড়িটা দুলিয়ে দিল।—সন্ধ্যাবেলা ওদিক থেকেই এসেছিল।

—তার মানে, আমাদের নদীর পার ধরেই খুঁজতে হবে। ঐখানেই বাচ্চাগুলো থাকবে।

ফেদকা বেশ চালাকের মত বলল: 'ও, আপনি তাহলে আপনার কুকুর খুঁজতে এসেছেন? বাচ্চা দিতে পালিয়েছিল বুঝি। কিন্তু ওখানে কিছুতেই খুঁজে পাবেন না: জঙ্গলটা জলায় ভরা, গাছগুলো সব দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে।'

ভোলোত্ খুড়ো হেসে বললেন:

—ভুল করেছ, খোকা—কুকুরটা আমার নয়। ও কারুরই নয়, আমি যখন খুঁজে বের করতে চলেছি তখন আশা করছি শীগ্‌গীরই ওটা আমারই হবে।

ঝোলাটা কাঁধে সরিয়ে দিয়ে ট্রাউজারের তলটা হাঁটু অবধি গুটিয়ে, রাইফেলটা হাতে নিয়ে সোজা নদীতে নেমে পড়লেন। তারপর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি কেবল, 'শিকারের জুতো পরেন না কেন? তাতে অনেক বেশি আরাম হত',—জিজ্ঞেস করবার সময় পেয়েছিলাম।

উত্তরে বলেছিলেন, 'গ্রীষ্মের সময় জল যখন গরম, তখন ওতে কী সুবিধে? একবার লম্বা বুটের ভিতর জল ঢুকে গেলেই মুশকিল। গ্রীষ্মে চালুনীর মত ফুটোওয়ালা জুতোর দরকার—জল ঢোকে আবার বেরিয়ে যায়। এখন তুমি দৌড় মার ভান্যুশা, নইলে ইস্কুলের দেরী হয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা তোমায় একটা বাচ্চা এনে দেব।'

সারাদিন নেকড়ে বাচচার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলাম না। সত্যিই আনবেন ত?

দিনটা ঘেঁতিয়ে ঘেঁতিয়ে এগতে লাগল, যেন ফুরবেই না। সূর্য ডুবে গেছে, ভোলোভ্ খুড়োর যখন দেখা মিলল তখন অন্ধকার হতে সুরু করেছে।

বললেন, 'কথা রাখতে পারলাম না, ভানিয়া, বাচচা আনতে পারলাম না।'

সেদিন সন্ধ্যায় এছাড়া আর একটি কথাও বললেন না। খাবার খেয়েই ঘুমতে গেলেন। বুঝতে পারলাম ঠিক স্বস্তি বোধ করছেন না, তাই আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

পরদিন ভোর হবার আগেই বেরিয়ে পড়লেন, আমি তখনও ঘুমিয়ে। ফিরলেন রাত্রে, আবার শূন্যি হাতে। এবার আর বাচচাটার বিষয়ে কিছুই বললেন না।

কী যেন সারাক্ষণ ভাবছিলেন, বিড়বিড় করে কী সব বকছিলেন। তার কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলাম:

— কোথাও একটা কিছু ভুল হয়েছে... সবকিছুই সম্ভব... আচ্ছা ধূর্ত জীব!..

শুতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন:

— ভান্যুশা। কাল ত র'ববার নয়, না?

— কেন, কাল ত র'ববারই।

— কালকে তোমার ইস্কুল নেই তো।

— নিশ্চয়ই না। র'ববার যে।

— তবে শোন। আমার একটা উপকার করবে, কাল সকালে আমার সঙ্গে আসবে? জান, উইলো গাছের ডালগুলো এমন ঘন হয়ে জড়িয়ে আছে, আমার পক্ষে তার মধ্যে দিয়ে গলে যাওয়া সম্ভব না, তুমি ছোট আছ — তুমি পারবে।

ভাগ্যিস — মা বাড়িতে ছিলেন না, নইলে এর শেষটা আর শোনা হত না।

মা বলতেন, 'এরকম একটা কাজে ছোট ছেলেকে নিয়ে যাওয়া, নেকড়েরা ত ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে — না, আমি ওকে যেতে দেব না!'

মা আর আমি আঁচ করেছিলাম, ফেদিয়া যেটাকে কুকুর বলে মনে করেছিল সেটা আসলে নেকড়েবাঘ।

তাই বললাম: 'মাকে কিন্তু বলবেন না। আমি বলব বন্ধুদের সঙ্গে ঘোড়ালেজা তুলতে যাচ্ছি। ঘোড়ালেজার মাথাটা খুব ভাল খেতে, সর্ষে ক্ষেতে অজস্র হয়েছে।'

— ঠিক আছে। কিন্তু ভয় পেও না — বিপদের কিচ্ছু নেই। তাছাড়া আমার ত বন্দুক আছেই।

— আপনি আমায় কী ভেবেছেন, আমি কি মেয়ে নাকি?

ভোরবেলা আমি ইচ্ছা করেই লুকিয়ে লুকিয়ে আগে বেরিয়ে পড়লাম। একটা ঘুর পথে গিয়ে রাখালদের কাছে পৌঁছলাম। ভোলোভ্ খুড়ো আগেই সেখানে এসে পড়েছেন। ফেদ্কাও এগিয়ে এল, যদিও সে জানে না আমরা কী খুঁজছি।

নদী ধরে কিছুটা উজিয়ে গিয়ে একেবারে ঘন উইলো ঝোপের মাঝখানে এসে পড়লাম। চারিদিকে উইলো গাছ, মাথার উপরে ডালে ডালে জড়াজড়ি হয়ে একেবারে গুহার মত হয়ে গেছে।

— এইখান থেকে সুরু করতে হবে, — ভোলোভ্ খুড়ো বললেন। — ভান্যুশা, তুমি তীরের ডানদিক দিয়ে যাও, ফেদিয়া, তুমি যাও বাঁয়ে। বাচচাগুলোর দিকে নজর রেখ, কিছু পেলেই, চেঁচিও। আমি সামনের পথটা ধরে এগোব — এখানটায় গাছগুলো তত ঘন নয়। আমি কাছাকাছিই আছি — তোমরা ডাকলেই শুনতে পাব। যদি কিছু না পাও, তবে ঠিক দুপুরবেলা এখানেই মিলব।

ফেদিয়া আর আমি দুজনে দুদিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগতে থাকলাম। ঝোপের পাতাগুলো তখনও ছোট ছোট রয়েছে, কাজেই কোথায় যাচ্ছি বেশ দেখা যায়, বিশেষ করে তলের দিকটা। কেবল দেখবার মত কিছুই নেই, না নেকড়ের পায়ের দাগ, না আর কিছু।

হামাগুড়ি দিয়ে এগনো খুব কঠিন। মাঝে মাঝে ঢিপি রয়েছে, তাদের মাঝখানে আবার চায়ের মত খয়েরী কাদা জল। ডালগুলো মুখে চাঁটির মত পড়ছে। নেকড়েরা এখানে এসে কী করবে? একটা হাঁস আর দুয়েকটা জলাপাখি দেখেছিলাম, আমায় দেখে তাদের কী চীৎকার, গোলমাল, ঝুটোপুটি! নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও ওদের বাসা আছে।

আরও এগিয়ে দেখলাম শুকনো। ছাতারে পাখির চ্যাঁচামেচি শুনলাম, আমায় দেখতে পেয়ে তাদের চ্যাঁচামেচি আরও ভীষণ হয়ে উঠল। প্রায় ডজনখানেক ছিল, আর রাম রাম, কী দুর্গন্ধ — বমি আসে। 'মর তোরা', — মনে মনে বললাম, — 'কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়।'

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। একটু বসে জিরিয়ে নেবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সূর্যটা তখন মাথার উপরে — তার মানে ঠিক দুপুর হয়েছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

ভোলোভ্ খুড়ো আর ফেদিয়া নদীর ধারে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

ভোলোভ্ খুড়ো বললেন, 'ফেদিয়া আর আমি ত কিছুই পেলাম না, তোমার কী খবর?'

— কোনও পথের চিহ্নই নেই, — আমি বললাম। — আমি যেখানে ছিলাম সেখানে কোনও কিছু খুঁজে লাভ নেই — কেবল ছাতারে পাখি পাওয়া যেতে পারে, দলকে দল। আর বিশ্রী পচা গন্ধ।

ভোলোভ্ খুড়ো এমনভাবে তাকালেন যেন মেডেল টেডেল কিছু একটা পেয়ে গেছেন।

— কী বললে — ছাতারে? আর নোংরা গন্ধ? ওঠ, তাড়াতাড়ি আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

খুব অধীরভাবে বন্দুকের বাঁটে পাইপটা ঠুকে ঠুকে নেবালেন, আগুনের ফুল্‌কিগুলো উড়ে গিয়ে জলে পড়ল। আমি তখন বেদম হাঁপিয়ে গেছি, ঐ জঙ্গলের মধ্যে আবার সেই কাঁটাখোঁচার আঁচড় খাবার একটুও ইচ্ছা হচ্ছিল না।

মনে মনে ভাবলাম, দুত্তোরি, লোকটার সবকিছুই উল্টো রকমের! প্রথমে ত যেখানে নেকড়ে থাকে না, সেখানেই নেকড়ের খোঁজ করা চাই! এখন আবার ছাতারের কথায় মরে যাচ্ছে। ছাতারে খুব সতর্ক পাখি — যেই মানুষ বা জন্তু দেখে, ওমনি হৈচৈ করে উড়ে পালায়।

ভাবলাম, যাই হোক, ওঁর অমূল্য ছাতারের কাছে ত ওঁকে নিয়ে যাই, জঙ্গলটা বেশি দূরেও নয় — তারপর আমার আর সময় নেই বলে জঙ্গলের ভিতর দিয়েই বাড়ি ফিরব।

ফেদিয়া ঠাকুর্দার কথা টথা বলে কাট মারল। বলল, 'গোরুগুলো সব কোথায় পালাবে, ঠাকুর্দা তখন খেপে লাল হয়ে যাবেন।'

ছাতারেগুলো তখনও সেখানে ছিল, পাগলের মত চীৎকার করছিল।

অল্প একটু দূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ের মত ব্যাপার, তার গায়ে একটা পাইনগাছের গোড়ায় ছোটখাট একটা খোঁদল। ঢালুর গায়ে চারিদিকে পাখি, খরগোস, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতির ছালচামড়া ছাড়ান শুকনো হাড় ছড়ান। সেই কারণেই এমন তীব্র গন্ধ।

ভেবে দেখ — আর পঞ্চাশ পা এগলেই আমি একা একাই নেকড়ের গর্তটা খুঁজে বের করতে পারতাম!

বাচ্চাগুলো খোঁদলে কুঁকড়ে শুয়ে ছিল।

ভোলোভ্ খুড়ো ঝোলাটা খুলে বাচ্চাগুলোর ঘাড়ের চামড়া ধরে একটা একটা করে তার মধ্যে পুরতে লাগলেন। ছটা ছিল, সবকটাই ঝোলায় পুরলেন। ছাই ছাই রং, ছোট ছোট শুঁটকো ল্যাজ, সবে চোখ ফুটেছে।

আমি চারিদিকে নজর রাখছিলাম — যদি হঠাৎ এদের বাবা-মা এসে পড়ে? ভয়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ভোলোভ্ খুড়ো খুসিতে জ্বলে উঠে বললেন, 'ব্যস, আমাদের আর কিছু করার নেই।'

— কিন্তু আপনি যে এদের মা'টাকেও মারবেন বলেছিলেন!

— এদের মা বা বাবা কারুরই এখন আর পাত্তা মিলবে না, যদিও দুটোই এখানেই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, আমাদের কথাবার্তা শুনছে। মা-নেকড়েটাকে ধরা — সে আলাদা ব্যাপার। তাড়াতাড়ি চল, ভান্যুশা।

পাহাড়টার ওপারেও ঝোপ ছিল, কিন্তু সেরকম নয়। দেখতে দেখতে আমরা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেলাম, তারপর পাইন বনে।

এখানে এসে ভোলোভ্ খুড়ো থামলেন, এদিক ওদিক মাথা ফিরিয়ে কী দেখলেন, তারপর বললেন:

— এইদিকে আমাদের যেতে হবে, এই পথ ধরে।

— তা কেন, না, না। আমরা উল্টো দিকে চলে যাব। গ্রামটা ত এই সামনেই।

ভোলোভ্ খুড়ো ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'দেখ হে, ছোকরা, আমায় আর শিখিও না। মরা লোকের চিকিৎসা আর অভিজ্ঞ লোককে শেখান — একই ব্যাপার। যা বলছি করে যাও, বক না। হাওয়ার প্রতিকূলে নাবিকদের কেন সব সময়ই যেতে হবে, অনুকূল বাতাস মাঝে মাঝে ত এক আধবার মেলে।'

আমি তখন রেগে আগুন: আবার লোকটা সবকিছু উল্টেপাল্টে দিচ্ছে। এই পথ দিয়ে গেলে বনটাকে চক্কর দিয়ে প্রায় আধা-আধি গিয়ে তারপর আবার মাঠ ঠেঙিয়ে ফিরে আসতে হবে — মাথার উপর আবার প্রচণ্ড সূর্য।

কিন্তু ওঁকে অমান্য করার সাহসও হল না।

আমি সামনে সামনে চললাম, উনি পিছন পিছন আসতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পরেই বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। সেটা পার হলে পর, পিছন থেকে ভোলোভ্ খুড়ো মৃদুস্বরে বললেন:

—সোজা এগিয়ে চল, পিছন ফির না, থেম না। আর এইটে নাও। তোমার পক্ষে খুব বেশি ভারী নয়, তাই না?

বাচচাগুলো সুদ্ধ ঝোলাটা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন, বাঁধনিগুলো বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে দিলেন।

ফিসফিস করে বললেন, 'তাড়াহুড়ো কর না, তা বলে থেমও না কিন্তু। আর যাই ঘটুক না কেন কিছুতেই পিছন ফিরে তাকিও না—তাকালে কিন্তু ভীষণ বিপদে পড়বে।'

এইটুকুই বাকি ছিল। বুড়োটা একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। নইলে অমন ফিসফিস করে কথা বলে কেন, আমায় এগিয়ে যেতে বলে পিছন ফিরতেই বা মানা করে কেন? একটু পরেই বন্দুকের নলদুটো আমার পিঠেই তাক করে খালি করবে, সে কথা ভেবে ভয়ে সিঁটকে গেলাম।

ভয়ে শিউরে উঠতে লাগলাম। হেঁটে চললাম, পিছন ফিরে তাকাবার সাহস নেই। কিন্তু পিছনে বুড়োর পায়ের আওয়াজ পেলাম না।

বোধ হয় আমায় বিপদে ফেলার জন্যই পথটাও একেবারে সোজা নাকবরাবর চলেছে। একটা কোনও বাঁক পেলেই আমি ঘুরে দৌড় মারতাম।

হাঁটুদুটো দুমড়ে যাবার মত হল, মাথা ঘুরতে থাকল।

কতক্ষণ ঐভাবে হেঁটেছি জানি না...

হঠাৎ পিছন থেকে—দুম্ দুম্।

চমকে উঠে, ঝোলা ঐখানেই নামিয়ে রেখে দে ছুট।

শুনলাম খুড়ো চেঁচাচ্ছেন: 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! কোথায় পালাচ্ছ?'

পিছন ফিরলাম, ভোলোভ্ খুড়োকে অনেক দূরে একটা মাঠের মধ্যে দেখতে পেলাম। মাটি থেকে কী যেন টেনে তুলছেন।

একটা নেকড়ে!

তখন সব ভয় ছেড়ে পালাল। দৌড়ে এসে ঝোলাটা তুলে নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম।

তিনি তখন কাঁধে মরা নেকড়েটাকে চাপিয়ে আমার দিকেই আসছিলেন। নেকড়েটার সামনের থাবাদুটো ধরে ছিলেন, ল্যাজটা মাটিতে লুটিয়ে ছিল।

—বোকা, হাঁদারাম! ভয় পেয়েছিলে কেন? এইটেই হচ্ছে মা'টা। আমি জানতাম, পিছন পিছন ওটা আসছে, দেখতে চায় কোথায় ছানাগুলোকে নিয়ে যাই। তারপর রাত্তিরে বাড়ি এসে বাচচাগুলোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। তাই ত তোমায় ঝোলাটা সুদ্ধ এগিয়ে দিয়ে, আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। মিনিট কয়েক পরেই এটা মাটিতে নাক ঠেকিয়ে দৌড়ে এল। পথটা শুঁকে শুঁকে ঠিক করছিল, আমার গন্ধ পায়নি; সেইজন্যই ত এই পথটা নিয়েছিলাম, হাওয়াটা আমাদের পিছন দিক থেকে বইছিল, নেকড়েটা তাই আমার গন্ধ ঠাওর করতে না পেরে একেবারে আমার কাছে চলে এল।

কী দারুণ বুদ্ধি, না? সবকিছু ভেবে ঠিকঠাক করে রেখেছিলেন।

বললেন: 'মনে রেখ, নেকড়ে হচ্ছে ভীষণ ধূর্ত জীব—যেমন তেমন করে ধরা যায় না। বসন্তকালে নেকড়েরা যেখানে গোরু, ভেড়া, কুকুর মারে, সেখানে তাদের বাসা খুঁজতে যেও না। মা'টা কখনও তার বাচচাদের ছেড়ে যায় না, বাবাটাই দূরে দূরে ঘুরে জন্তুটন্তু মেরে মা আর বাচচাগুলোর জন্য নিয়ে আসে। জঙ্গলের মধ্যে গর্ত করে ভালভাবে লুকিয়ে থাকে—এমনকি পাশ দিয়ে কোনও গোরু ভেড়ার পাল গেলেও কিছু করবে না। যদি কেউ তোমায় বলে, 'এইখানে খোঁজ কর।'—তার একেবারে উল্টো দিকে চলে যাবে! তবেই নেকড়ের খোঁজ পাবে।'

তারপর আরও বললেন:

—তুমি ভেবেছিলে, ছাতারে পাখি নিশ্চয়ই নেকড়েকে ভয় পায়, তাই না? ভেবেছিলে, ছাতারে পাখি যখন চরে বেড়াচ্ছে, তখন আর ওখানে নেকড়ের সন্ধান করে লাভ নেই? কিন্তু, ঠিক তার উল্টো। নেকড়ের খাবার পরও কিছু বাকি থাকে, হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা কিছু মাংসের টুকরো, আর সেইখানেই ছাতারেদের বাস—ওরাই ত সর্বাগ্রে নেকড়ের সন্ধান বাৎলে দেয়। বনের প্রত্যেকটি ইঙ্গিত পড়তে শিখতে হবে, ঠিক আমার নাম যেমন করে পড় সেই ভাবে: উল্টো, সোজা দুদিক থেকেই। নাও, ভান্যুশাবাবু, পাইপে এটা পুরে টান মার।

ভোলোত্ খুড়ো আমায় একটা নেকড়ের বাচচা উপহার দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ঠিক কুকুরের মত পোষ মানবে। কিন্তু মা সে সব শুনলেন না। এত খারাপ লাগল, ভীষণ হতাশ হলাম।

কিন্তু ফেদিয়া, সেই রাখাল ছেলেটা যখন ছানাগুলো আর তাদের মরা মা'কে দেখল, আর শুনল কী ধরণের জানোয়ার তার খুব কাছেই এতদিন ছিল, তখন তার অবস্থা আমার চেয়ে আরও অনেক খারাপ হল।

পরে দেখা গেল আমরাই সব উল্টোপাল্টা করছিলাম—খুড়ো তিতু ভোলোভের মত শেষ পর্যন্ত ঠিক যা করবার তা আমরা করতে পারতাম না।

ঝুড়ির মধ্যে কান

(সহরের একটি ইস্কুলের ছেলের বলা)

গল্প ঠিকভাবে বলা না হলে আমার মোটেই ভাল লাগে না। যেমন এই ভেন্‌কা অভেচ্‌কিন্‌ বলে। ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল, না রূপকথা, তা বোঝবার জো নেই। আর ও আরম্ভও করবে, হয় মাঝখান থেকে, নয় শেষে, তার ফলে গল্পটা সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

কালকে আমরা দুজনেই বারান্দায় এমনি বসেছিলাম, কিছুই করছিলাম না। বাবা আবার খাবার পর দুটি ঘণ্টা ফুটবল খেলা বা সাঁতার কাটা কিছুই করতে দেবেন না। তাঁর বক্তব্য, আগে খাবারটাকে হজম করতে হবে। তাই দুজনে বসে গল্প করতে করতে খাবার হজম করছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ ভেন্‌কা আমার পাঁজরে খোঁচা মেরে রাস্তার দিকে তাকাল।

আমিও তাকালাম, দেখলাম দুজন লোক হেঁটে যাচ্ছে: একজন বুড়ো, গঙ্গাফড়িং-এর চেয়ে উঁচু নয়, আরেকজন অল্প বয়সী, দেখে মনে হয় হেভী-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন।

ভেন্‌কা ফিসফিস করে বলল, 'কে জানিস?'

আচ্ছা ছেলে! কেমন করে জানব? উরাল অঞ্চলে এই ত প্রথম এলাম।

ভেন্‌কা বলল: 'ঐ হচ্ছে বুড়ো ইনতার্‌, ভালুক শিকারী, সঙ্গে তাঁর নাতী ছোট পাশ্‌কা। বুড়ো ওকে ঘাড়ে পিঠে করে দুটি বছর বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছেন।'

আমি ছ্যা ছ্যা না করে পারলাম না। লোকটার চেহারাটা দেখ না, ঐ ধুমসো চেহারা নিয়ে ঐ ক্ষুদে বুড়ো লোকটার কাঁধে চড়ে। ঠিক রুস্‌লান্‌ আর চের্নোমোর-এর* মত। কেবল চের্নোমোরের মত লম্বা দাড়ি আর কারও ছিল না, এ লোকটার চুল দাড়ি কিছুই নেই।

ভেন্‌কা জিজ্ঞেস করল, 'এতে ওরকম করার কী আছে? ছ্যা ছ্যা করছিস কেন, বোকার মত!'

—সত্যিই মজার গল্পটা। হয়ত তুই গল্পটা ঠিক বলতে পারছিস না—আবার শেষ দিক থেকে বলছিস?—আমি বললাম।

—মোটেই শেষ দিক থেকে নয়। এর কোনও শেষই নেই। কী ভাবে সুরু করতে হবে শুনি? 'একদা এক...' বলে?

—নিশ্চয়ই। যদি রূপকথা হয় তবে বলতে হবে: 'অনেক কাল আগে এক বুড়ো আর একটি অল্প বয়সী ছেলে ছিল...'

—আর যদি সত্যি গল্প হয়?

—তবে এই ভাবে আরম্ভ করতে হবে: 'অমুক জায়গায়, অমুক সময়ে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল...'

বুড়ো আর তার নাতী অনেক আগেই মোড়ের বাঁকে উধাও হয়ে গেছে, বেশ বুঝতে পারছিলাম ভেন্‌কা ওদের কথা আমায় বলার জন্য একেবারে মরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ উসখুস করে শেষমেস বলেই ফেলল:

—ঠিক আছে, তোর মতই বলছি।

একটু ভেবে নিয়ে তারপর সুরু করল:

—বোধ হয় পনেরো বছর আগে আমাদের জেলায় ব্যাপারটা ঘটেছিল। অনেক কাল আগে সেই গ্রামে থাকত...

—থাম, থাম, অভেচ্‌কিন্‌! একই সঙ্গে দুরকমভাবে সুরু করলি: 'এই ঘটেছিল' আর 'অনেক কাল আগে'। আগেই ত বাবা ঠিক করে নিয়েছি, সত্যি ঘটনা হলে...

—সত্যি ঘটনাই ত,—ভেন্‌কা আমায় মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল।—এর চেয়ে

---

*রুশ কবি আ. স. পুশ্‌কিনের (১৭৯৯—১৮৩৭) 'রুস্‌লান্‌ আর লিউদ্‌মিলা' নামক কবিতার বিখ্যাত চরিত্র।

সত্যি আর কিছুই হতে পারে না। যাকে খুসি জিজ্ঞেস কর। কিন্তু তবুও আমি 'অনেক কাল আগে' দিয়েই সুরু করব, কারণ এটা ভালুক শিকারী, বুড়ো ইনতারের কথা। বুড়ো ইনতার ঐ পাহাড়গুলোর মতই বুড়ো ... ঠিক রূপকথায় যেমন হয়। তুই নিজেই দেখিস। যাই হোক, এখন শোন, বার বার বাধা দিস না।

—অনেক কাল আগে ইনতার নামে এক বুড়ো ছিল, সে ভালুক শিকার করত। বয়সকালে সে যে কত ভালুক মেরেছে তা সে নিজেই মনে রাখতে পারেনি। আর কতরকম মুশকিলে পড়তে হয়েছে! অনেক সময়েই বন্দুকের গুলি ঠিকমত বেরয়নি; দুবার ভালুকে তাকে পেড়ে ফেলেছিল, সে ছুরি দিয়ে ভালুকের পেট কেটে ফেলেছে। সব সময়েই ভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন ছিল, কেবল একবার ছাড়া, সেবার ভালুকটার হঠাৎ শীতের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

সেরকম ভালুক কী সাংঘাতিক হয় তা জানিস ত? ঘুমটা ভেঙেছে কিন্তু মারতে পারা যায়নি। ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে সারা শীত বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই, কারণ ভালুকের তো নানা জাতের গাছপালা, শিকড় বাকড় আর পিঁপড়ের বাসা খাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, সে সবকিছুই ত তখন বরফের কোন তলায়। খরগোশ আর ছোট বড় হরিণ শিকার করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকে না। সেরকম ভালুক মানুষকেও আক্রমণ করে—ক্ষিদেয় তার সাহস বেড়ে যায়।

একবার ইনতার দাদু স্লেজে চড়ে জ্বালানি কাঠ আনতে বনে গিয়েছিল। সঙ্গে কুকুর-টুকুর নেয়নি—কেনই বা নেবে, শিকার করতে ত আর যাচ্ছে না! সেই সময় দেখা হল একটা ভালুকের সঙ্গে!

দাদুর বন্দুকটা অবশ্য সঙ্গে ছিল। গুলি করল কিন্তু লাগল না: গোঁয়ারটা পালিয়ে গেল।

দাদু স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে, ঘোড়াটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে, ভালুকটার পিছনে দৌড়ল।

ভালুকের পথ ধরে ধরে বেশ চলেছে, কপালে যে কী আছে কোনই ধারণা নেই। ভালুকটা নরম বরফ খুঁড়ে তলের মাটি পর্যন্ত সুড়ঙ্গের মত নালা বানিয়ে ফেলেছিল। দূরে গাছের গুঁড়ির মাঝখানে দাদু ভালুকটাকে দেখতে পাচ্ছিল। তাই সোজা সামনে তাকিয়ে দাদু চলতেই থাকল।

হঠাৎ ভালুকটা পাশ থেকে ছুটে এসে মুহূর্তের মধ্যে দাদুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভালুকটা কী কায়দা করেছিল এখন ভেবে দেখ। সামনে দৌড়ে গিয়ে তারপর পাশে বেঁকে গিয়ে আবার যেখান থেকে চলতে সুরু করে সেখানেই ফিরে এসেছিল। সেখানে এসে পাশের একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে গিয়েছিল, একটা উপড়নো গাছের তলে। তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ইনতার দাদু বন্দুক তোলারও সময় পেল না।

ভালুকটা একচড়ে বন্দুকটা ভেঙে ফেলল, দাদু একেবারে নিরস্ত্র। তারপর প্রথমে দাদুর একটা কান, তারপর আরেকটা কান মলে বরফের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল:

—এই নে, আমাদের, ভালুকদের মারার উচিত শিক্ষা দিলাম!...

—থাম, থাম, করছিস কী?—চেঁচিয়ে উঠে অভ্চেক্‌কিন্‌কে বললাম। সে তখন সব কিছু ভুলে গিয়ে যে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে ভালুকটা কেমন করে দাদুর কান মলেছিল তাই দেখাতে সুরু করেছে ...—ভালুকটাকে দিয়ে যে কথা কওয়াতে সুরু করলি?...

—ও!...—ভেন্‌কা আবার মাটিতে নেমে এল।—তাই ত।...

আমি বললাম:

—তবেই দেখ্, অভ্চেক্‌কিন, 'অনেক কাল আগে' দিয়ে সুরু করলে শেষ পর্যন্ত গল্পটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?... তোর ভালুকটা মানুষের মত কথা বলছে।

—আমায় খোঁচাস না, বলছি! তোর যদি শুনতে ইচ্ছা না হয়, তবে শোনার দরকার নেই।

কিন্তু তখন ইনতার দাদুর কী হল না জেনে থাকতে পারছি না।

—ঠিক আছে... বল্, বল্!

—তারপর ত,—ভেন্‌কা বলে চলল,—দাদু তার ছুরি বের করল। ভীষণ জানোয়ারের পেট দাদুকে এই প্রথম কাটতে হচ্ছে না।

কিন্তু ভালুকটাও ত আর বোকাহাবা নয়। দাদুকে ছেড়ে দৌড়ে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

ইনতার দাদু উঠে, গায়ের বরফ ঝেড়ে ফেলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল: পাইন বনটার কী হয়েছে? এতক্ষণ বাতাসের গর্জন, গাছের কোঁকানি আর ঘোড়ার ভয়ার্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। এখন সব কিছু একেবারে কবরখানার মত নিস্তব্ধ। দাদু ত যতটা দেখল,

তাতে বুঝল এইখানেই ভালুকটা তাকে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু তবুও জায়গাটা অন্য রকমের লাগছে, যেন মন্ত্র পড়ে কেউ সব কিছু থামিয়ে দিয়েছে।

দাদু প্রথমে বুঝতে পারেনি যে বনের কিছুই হয়নি, হয়েছে তার নিজের। তখন পর্যন্ত কানদুটোর ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করেনি। কোনরকমে ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে, বাঁধন খুলে টলমল করে গাড়িতে উঠল, — ঘোড়াটা তাকে বাড়িতে নিয়ে এল।

এক মাসেরও বেশি বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ভালুকটা ... কী যেন বলে? ... পর্দার কান ... না, কানের পর্দা — সেই কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছিল, ঘিলু নড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু দাদু সেরে উঠে আবার হাঁটাচলা স্বরু করল।

তার ছেলে আঙুল দিয়ে দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে তার আর শিকার করার অবস্থা নেই। কালার পক্ষে শিকার করা সম্ভব নয় — এখন থেকে ঘরে বসে জুতো মেরামত করতে হবে।

সে কথায় দাদুর কী রাগ। মাথা নেড়ে জানলার গায়ে এক কিল বসিয়ে দিল।

কিলটা, বোঝা গেল, ভালুকের জন্য। 'এখনও এই কিল ওটাকে খেতে হবে।' — এই কথাই বলতে চেয়েছিল।

দুঃসময়ের জন্য কিছু টাকা তার জমান ছিল, সেটা ছেলেকে দিয়ে বলল: 'সহরে গিয়ে আমার জন্য একটা দোনলা ইজেভ্স্ক বন্দুক কিনে আন।'

ছেলে ত আর বাপের কথা অমান্য করতে পারে না, তাই সে গিয়ে বন্দুক কিনে আনল।

পরের দিনই ইনতার দাদু শিকারী কুকুরগুলোকে নিয়ে তাইগায়* চলে গেল।

সারাদিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময়, বাজপড়া মেঘের মত কালো চেহারা করে ফিরল।

আর তা ত হবেই। কুকুরগুলো ত বনে বহু দূরে দূরে চক্কর মেরে ঘোরে, তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন, আর কোনও কিছু দেখলেই ওরা চেঁচায়। ওরা কেবল ডেকেই চলেছে, কিন্তু আকাট কালা ঐ বুড়োর তাতে কী লাভ? তাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বনে

---

* সাইবেরিয়ার ঘন পাইন বন।

বেফায়দা ঘুরেছে। এখানে একটা চলতি কথা আছে যে বনের মধ্যে কানই আগে আগে চলে, চোখ তার পরে — কথাটা খুবই সত্যি।

চুল্লীর উপর যে বাংক্ থাকে ইনতার দাদু সেইখানেই তিন দিন তিন রাত্তির শুয়ে রইল, একটি কথাও বলল না।

চার দিনের দিন নেমে এসে, যে ঝুড়িটা কাঁধের উপর রুক্স্যাকের মত করে বাঁধত, সেটা বের করে, তার নাতী পাশ্কাকে ডাক পাঠাল।

পাশ্কা তখন সত্যিই খুব ছোট্ট। তিন বছর চলছে।

দাদু ঝুড়িটার চারপাশে আরও মজবুত করার জন্য একটা থলের মোড়ক লাগিয়ে, ফিতে দিয়ে ভাল করে বাঁধল। পাশ্কাকে তার মধ্যে ঢুকতে বলল, তারপর ঝুড়িটাকে নিজের পিঠে ঝোলাল, বন্দুক তুলে নিল, কুকুরগুলোকে শিস দিয়ে ডাকল, বনের দিকে রওনা হল।

পাশ্কার বাবা যাবার আগে পাশ্কাকে বলে দিল বনে গিয়ে কী করতে হবে।

কুকুরগুলো ত কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল: গন্ধের খোঁজে। ইনতার দাদু বনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাচ্ছে। বাচচা পাশ্কা দাদুর পিঠে চড়ে আছে, মাথাটা ঝুড়ি থেকে বের করা, নাকটা খালি এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, চারিদিকের দৃশ্য বেশ মজাসে দেখছে।

দাদু ত এইভাবে পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গল, প্রান্তর ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

সেই ভালুক আর ছোট্ট মেয়ে মাশার রূপকথাটা মনে আছে? সেই যে মাশা তার বাপমাকে বাড়িতে উপহার পাঠাতে চেয়েছিল। কথা ছিল ভালুকটা উপহার বয়ে নিয়ে যাবে, মনে করে দেখ। তারপর মাশা চালাকী করে ঝুড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভালুকটা ঝুড়িটা কাঁধে নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বলল:

— গাছের এই ছোট্ট গুঁড়ি,
তার উপর বসেই পড়ি,
খাওয়া যাক একটা পিঠে।

কিন্তু মাশা চেঁচিয়ে উঠল, যেন ভালুকটা তাকে যেখানে রেখে এসেছে সেই জানলা দিয়েই সে সব দেখতে পাচ্ছে — আসলে কিন্তু ঝুড়ির ভিতর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল:

—আমি সব দেখতে পাচ্ছি। বসলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি, আর পিঠে খেলে কিন্তু দেখবে।

ইনতার দাদুরও ঠিক তাই হল। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা গুঁড়ির উপর বসল বিশ্রাম করতে।

যেই বসা অমনি ডানদিকের কুকুরগুলো চেঁচাতে থাকল: গন্ধ পেয়েছে।

দাদু অবশ্য কিছুই শুনতে পেল না। চুপচাপ বসে বিশ্রাম করতে লাগল। কিন্তু বাচ্চা পাশ্‌কা ঝুড়ি থেকে চেঁচাতে লাগল:

—শুনতে পেয়েছি। বসে থেক না, কুকুরগুলো দূরে ডাকছে।

দাদু পাশ্‌কার কথাও শুনতে পেল না, বসেই রইল। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করেই চলল।

তখন পাশ্‌কা ঝুড়ি থেকে গুঁড়ি মেরে উঠে দাদুর কানটা পাকড়ে ধরল।

দাদু লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি যেদিক থেকে কুকুরের ডাক আসছিল সেদিকে চলতে লাগল। পাশ্‌কা পিছন থেকে দাদুকে ঘোড়ার মত পথ বাৎলে দিতে থাকল। ডাকটা ডানদিক থেকে এলে, পাশ্‌কা ডান কান ধরে টানল, বাঁদিকে হলে—বাঁ কান।

শেষ কালে গাছ পার হয়ে ওরা একটা মাঠে এসে পড়ল, কুকুরগুলো জন্তুটাকে সেখান থেকে নড়তে দিচ্ছে না। একটা কুকুর পাগলের মত ভালুকটার সামনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আর দুটো তার পিছনের পা কামড়ে পড়ে আছে, আর দাঁত দিয়ে লোম ছিঁড়ছে, পাদুটো যেন ভালুকটার ট্রাউজার, ভালুকটাকে এক পাও নড়তে দিচ্ছে না।

সে এক বিরাট, ভীষণ ভালুক, শীতকালে যেটা দাদুকে ধরেছিল, ঠিক সেটার মত।

বাচ্চা পাশ্‌কা ভয়ে ঝুড়ির ভিতর চুপ করে ইঁদুরের মত লুকিয়ে আছে।

ভালুকটা দাদুকে দেখে তেড়ে এল, কুকুরগুলোও ভালুকটাকে ছাড়ল না, কামড়ে ধরে তার পিছনে জোঁকের মত ঝুলতে থাকল। ভালুকটা কুকুরগুলোকে কামড়াতে চেষ্টা করল, ঝেড়ে ফেলতে চাইল। তাই দাদুর দিকে মুখ ফেরাতে হল। দাদুও গুলি করার সুযোগ পেল।

দোনলা বন্দুকের এক গুলি: দুম্, ভালুকটাও পড়ল মাটিতে। গুলিটা একেবারে সোজা বুকে গিয়ে লেগেছিল।

তারপর গাছের গুঁড়িতে বসে বিশ্রাম করার সময় হল দাদুর। ঝুড়িটা নামিয়ে পাশ্‌কাকে বের করল।

পাশ্‌কা যখন দেখল ভালুকটা মরে পড়ে আছে আর কুকুরগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, চেঁচাতে চেঁচাতে দাদুর কাছে দৌড়ে এল। ও ত তখন খুবই ছোট, জানে না যে ভালুকটা মরে গেছে, তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ঐ প্রথম শিকারে গেছে, তাই এ সবে ও ঠিক অভ্যস্ত নয়।

পরে অবশ্য পাশ্‌কা দাদুকে শান্তচিত্তে কোন দিকে ভালুক আছে বাৎলে দিতে পারত, এমনকি ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়েও থাকত না, দাদুর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখত ভালুকটার সঙ্গে কাণ্ডটা কী রকম চলছে।

স্বভাবতই, অত অল্প বয়স থেকে শিখে পাশ্‌কা ভালুকদের হাবভাব সব জেনে ফেলেছিল, বড় হয়ে চমৎকার শিকারী হয়ে উঠেছিল। এ জেলায় ওই সবচেয়ে ভাল শিকারী — প্রায় প্রতি বছরই ও পুরস্কার পায়। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছুই নেই, তাই না?

অভেচকিন চুপ করে গেল।

— শেষ হয়ে গেল? — আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেল। এর বেশি আর কী চাস?

বললাম, 'গল্পটা মোটেই খারাপ নয়। লিখে ফেল: আমি আমাদের ইস্কুলের পত্রিকায়

চালিয়ে দেব। কিন্তু গল্পটার কোনও শেষ নেই। তোকে একটা কিছু ভেবে বের করতে হবে — এই রকমের একটা কিছু : "এইভাবে বিখ্যাত ভালুক শিকারী, ইনতার দাদু, তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, হেভী-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন, দৈত্য ছোট পাশ্‌কাকে তৈরী করে নিজে শিকার থেকে অবসর নিল।"'

— খেপে গেছিস নাকি? — অভেচ্‌কিন্‌ তেড়ে উঠল। — মস্ত গপ্প লিখিয়ে। 'ইনতার দাদ অবসর নিয়েছে'।... কী করে ভাবলি। ওত এখনও শিকার করে।

— কিন্তু তোর ঐ বাচচা পাশ্‌কার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ! তুই কি বলতে চাস ঐ ধুমসো লোকটাকে দাদু এখনও ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়ায়?

— তুই একটা গাধা! এতদিন ঝুড়ির ভিতরে দাদুর কান ছিল, এখন সে কান রয়েছে দড়িতে, ইনতার দাদু নিজেই বলে।

— 'দড়িতে' মানে?

— মানে বেশ পরিষ্কার! দাদু একটা দোআঁসলা কুকুরকে শিখিয়েছে। সেটা তার বেল্টের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, কুকুরদের ডাক শুনলেই সে দাদুকে সেদিকে নিয়ে যায়। এই ত ব্যাপার। বুঝতে পারলি?

ঠিক, ব্যাপারটা খুবই সোজা... কিন্ত গল্পটা শেষ করা যায় কী ভাবে? তার মানে ত ইনতার দাদু এখনও ভালুক মেরে চলেছে আর চিরকাল মেরেই চলবে?

তবে কি দাদু মারা না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব? তার পরে আমাদের ইস্কুলের পত্রিকায় গল্পটা ছাপাব?

আমি হচ্ছি ইস্কুলের পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, আবার সমালোচনা বিভাগের অধ্যক্ষ।

আমি কি এমন কোনও সাহিত্য রচনা ছাপাতে পারি, যার শেষটা ঠিকমত লেখা হয়নি, পারি কি?

রঙিন রাত্রি

শিকারের পর গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম।

স্তেপের ভিতর দিয়ে পথটা চলে গেছে, পড়ে যাওয়া টেলিগ্রাফের পোলের মত মসৃণ, সোজা।

দেখতে দেখতে রাত হয়ে আসছে। কিন্তু আমরা ততক্ষণে ত্রিশ মাইল পথ পার হয়ে এসেছি, সহর খুবই কাছে, আর মাত্র আধঘণ্টা লাগবে পেঁছতে। ড্রাইভার পেত্যা নোসিক্ খুব জোর গাড়ি চালিয়েছে।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ আসনে বসে খালি উসখুস নড়া চড়া করছিল, ওর সেই অসংখ্য পকেটগুলোয় হাত ভরে কী সব খুঁজছিল। তারপর হঠাৎ মেঝেতে নেমে যে বুনো মুরগিটা সেদিন পেয়েছিলাম, সেটাকে খালি এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে সরাতে লাগল।

—কী খুঁজছ?

—আমার সিগারেট কেস্‌টা কোথাও দেখেছ?

—হ্যাঁ, তুমি ত শেষ যেখানে থামলাম সেখানে সিগারেট বের করে খেলে। মনে আছে, গাড়িতে ওঠার ঠিক আগে, সেই নালাটার ওপারে বসে আমরা সিগারেট খাচ্ছিলাম?

—ঠিক, তাই ত।... তার মানে ওখানেই ফেলে এসেছি—আমাদের ফিরতে হবে।

—কথাটার কোনও মানে হয়। আমার কাছে যথেষ্ট সিগারেট আছে, বাড়ি পেঁছন পর্যন্ত হয়ে যাবে। কেস্‌টা মরুক গে: তেমন কিছু দামও নয়।

—না, না, ফিরতেই হবে। আমাকে যেতেই হবে।

অধ্যাপককে অত্যন্ত বিচলিত দেখাল। চুলগুলো সব উস্কোখুস্কো, অতি যত্নে ছাঁটা নূরও হাস্যকরভাবে খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। তখনও খুঁজে চলেছে, পাশে, পিছনে, বুকে—এক কথায় যেখানে যেখানে পকেট আছে সেখানেই থাবড়া মারছে। তার টুইডের টুপীটা বার বার এখান থেকে ওখানে সরিয়ে দেখছে যদি ভুল করে তার তলেই রেখে থাকে।

—কিন্তু সত্যি বলছি, আমার কাছে অনেক সিগারেট আছে। এই নাও, একটা নাও।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ সিগারেটটা নিয়েও জোর করতে লাগল:

—পেত্যা, একটু উপকার কর ভাই, গাড়িটা ঘোরাও। ফিরিয়ে নিয়ে চল।

—অসম্ভব। তোমার যে এমন সংকীর্ণ মন, তা জানতাম না—একটুকরো কাঠের জন্য খেপে উঠেছ।

—কিন্তু আমার কারখানায় ঢোকার পাস্‌টা যে ওর মধ্যে রয়েছে।

—কী বললে?

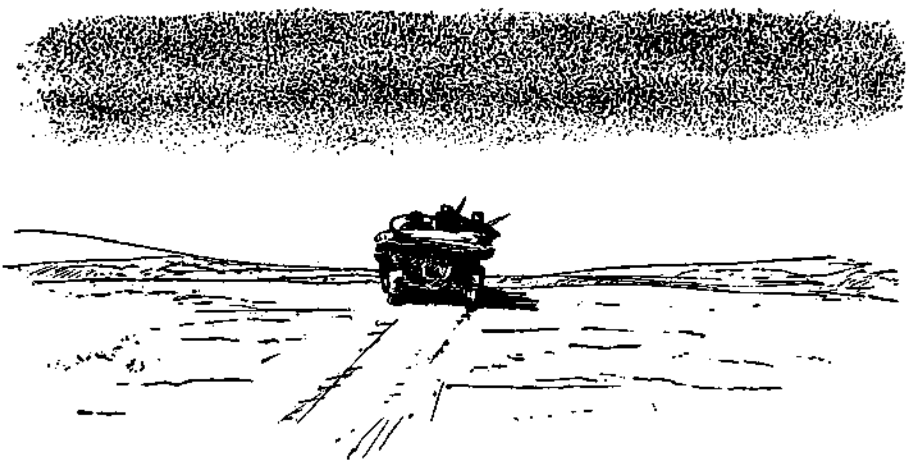

—কারখানায় ঢোকার পাস্‌টা সিগারেট কেসে পুরে রেখেছিলাম। কালকে আবার ল্যাবরেটরীতে যেতে হবে, পাস্‌ ছাড়া যাব কী করে!

হেসে উঠলাম।

—ট্রেনে আমার সেই অল্পবয়সী উসখুস করা প্রতিবেশীর কথা তুমি মনে পড়িয়ে দিলে। আমি ছিলাম নিচের বার্থে, ও ছিল উপরে। মাঝরাত্রে হঠাৎ গোঙানি আর কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। লোকটা মেঝেতে কোটের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন জানি না কাঁদছে।

—কী হল?—জিজ্ঞেস করলাম।

—আমার কোট পড়ে গেছে!—ফোঁৎ ফোঁৎ করে সে বলল।

—তোমার কোট পড়ে গেছে! তা, তুলে নিয়ে, ঝেড়ে ঝুড়ে নাও। তবেই ত ল্যাঠা চুকে গেল।

—হ্যাঁ... কিন্তু আমি যে কোটটার মধ্যে শুয়ে ছিলাম।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্‌ আমার গল্পটা মোটেই উপভোগ করল না। সে তখন অত্যন্ত বিচলিত।

পেত্যা নোসিক্‌ গাড়িটাকে এক ঝাঁকানিতে ঘুরিয়ে, কোনও কথা না বলে, মাথার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে আরও জোর চালাতে লাগল।

মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকার এসে গাড়ির পাশের জানলাগুলো জড়িয়ে ধরল। কিন্তু আমাদের সামনে, গাড়ির আলোয় রাত্রি রঙিন হয়ে গেছে, রূপকথার গল্পের ছবির মত।

উরাল স্তেপ দিয়ে রাত্রিবেলা আমি এই প্রথম চলেছি। এতদিনের এত পরিচিত এই স্তেপ আমার চোখে নতুন আলোয় দেখা দিল।

মস্ত চওড়া রাস্তাটা, কত তার রঙ—সাদা, ছাই ছাই, লালচে, হলদে—চাকার নিচে বিরাট ইঞ্জিনের বেল্টের মত গুটিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তার ধারের পোলীন* ঝোপ বনে পরিণত হল, ঘাসের প্রত্যেকটি শিষ পরিণত হল গাছে।

ছোট্ট বনটা যেন আমাদের দিকে দৌড়ে এসে হঠাৎ, পৌঁছবার আগেই কোথায় বাঁক খেয়ে মিলিয়ে যেতে থাকল।

গাছগুলো কালো আকাশে মাথা খাড়া করে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। তাদের হলুদে সবুজে মেশান পাতা কাঁচের পাতের মত ঝলসাতে লাগল।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ তখনও এ পকেট সে পকেট খুঁজেই চলেছে, আর নিজের মনেই বিড়বিড় করে ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছে।

—একবার সামনেটা দেখ! কী চমৎকার, না? সিগারেট কেসের ভাবনা রাখো, খুঁজে পাব, ভয় নেই!

—দেখব কেমন খুঁজে পাও...

ঠিক সেই সময়েই চাকার সামনে পাখার মত কী যেন জ্বলে উঠেই, গাড়ির দুপাশে মিলিয়ে গেল।

অন্ধকার থেকে উইলো-টারমিজান পাখির কুকুর ডাকের মত তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল।

সে ডাকে ভীক্তর স্তেপানভিচ্ পর্যন্ত খুসি হয়ে উঠল।

—শুনতে পেলে? গালাগাল দিচ্ছে! বুঝতে পারছ কী বলছে? 'কপ্‌সিয়ে—দূর হ—দূর হ। ভয় দেখাস, ভয় দেখাস!' তোমায় বলছে, পেত্যা!

পেত্যা হেসে উঠল। কথার আওয়াজটা একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে, সত্যিই ভীত টারমিজানের ডাকের মত শোনাচ্ছিল।

—নোসিক, জোরে, আরও জোরে।—ভীক্তর স্তেপানভিচ্ অনুরোধের সুরে বলল।

---

*একধরণের ঘাস, লম্বা সরু পাতা, খেতে তেতো।

—দেখ, দেখ।—পেত্যা চেঁচিয়ে উঠল।

একটা লম্বা-কান খরগোস গাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছিল। হঠাৎ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় খরগোসটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে লাফাচ্ছিল, যেন কোমর থেকে ট্রাউজারটা খুলে পা বেয়ে পড়ে গিয়ে ওকে পালাতে দিচ্ছে না।

পেত্যা নোসিক গাড়িটাকে একেবারে খরগোসটার সামনে নিয়ে এল।

খরগোসটা ভয় পেয়ে বাঁ দিকে লাফিয়ে একবার ঘুরে দেখেই পিছনে আরেক লাফ মারল।

নালাটা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে, সেখানে আবার কিসের ভয় পেয়ে, চওড়া রাস্তাটার একেবারে মাঝখানে ছিটকে এসে পড়ল।

পেত্যা, ওস্তাদ ড্রাইভার, এঁকে বেঁকে তার পিছনে লেগে রইল।

—জীপ্।—প্রায় চাপা পড়েছিল আরকি।

কিন্তু খরগোসটা বেপরোয়া হয়ে অদ্ভুত একটা লাফ মারল, সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার তাকে গিলে ফেলল!

পেত্যা নোসিক্ ভীষণ জোরে হেসে উঠল ।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ বিড়বিড় করে বলল:

—...নিশাচর। রাত্তির বেলা রাস্তার মাঝখানে কোন তাড়ায় এরা আসে?

খুব তাড়াতাড়িই আমরা প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পার হয়ে গেলাম। দুটো গ্রামও পেরিয়ে গেল, সেখানে তখন সবাই ঘুমচ্ছে। এমনকি কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে তাদের অভ্যাসমত আমাদের অভিনন্দন জানাল না।

আমাদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছি।

এমন সময় হঠাৎ সামনে রাস্তার উপর দেখলাম: একটা সবুজ সরু ফালি একবার ঝিলকে উঠে মিলিয়ে গিয়ে আবার জ্বলে উঠল।

আলোটায় একটা ভয়াবহ কী যেন ছিল, ক্রমশঃ আরও ভীষণ হয়ে উঠে হঠাৎ দুটো গোল ফোঁটায় ভাগ হয়ে গেল, দুটো লণ্ঠনের মত তাকিয়ে থাকা চোখ।

—একটা বুনো জন্তু!—চেঁচিয়ে উঠলাম।

পেত্যা আর ভীক্তর স্তেপানভিচ্‌ও দেখেছিল। পেত্যা যন্ত্রচালিতবৎ গিয়ারটাকে চেপে ধরল। ভীক্তর স্তেপানভিচ্ বন্দুকটা বের করল।

সত্যিই জন্তু, ভীষণ জানোয়ার। আমাদের দিকে পাশ ফিরে যখন শেষ একবার তার সবুজ চোখের ঝিলিক দিয়ে গেল, তখন পুরো চেহারাটা দেখতে পেলাম। দুটো আগুনই তখন দ্রুত নড়া-চড়ার ফলে, মিশে গিয়ে একটা ফিতের আকার নিয়েছে।

বিরাট এক নেকড়ে। গাড়ির আলোয় পোলীন ঝোপের জঙ্গলে আরও বড় হয়ে উঠে, নেকড়েটাকে দৈত্যের মত দেখাচ্ছিল।

ঘন খয়েরী লোম পিঠে আর বুকের কাছে ফুলে উঠেছে; মুখে বের করা দাঁতগুলোর সাদা ঝলক। মোটা, ফেঁপে ওঠা ল্যাজ পিঠের লাইনে সোজা হয়ে আছে, তাতে নেকড়েটাকে তার শরীরের চেয়ে দ্বিগুণ বড় দেখাচ্ছিল।

এক মুহূর্ত ঐভাবে থেকে, নেকড়েটা পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে দৌড় মারল।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ আর আমি দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম, কী ভাবছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করার কোনও দরকার ছিল না: গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে আমরা গুলি করতে পারব না। পেত্যার উপরেই এখন সব ভার।

পেত্যা নিজেও তা বুঝেছিল। আমাদের বিপদের সংকেত জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বলল:

— তৈরী থেক।

জোর চলতে লাগলাম।

বুনো জন্তুর সজীব পেশীর শক্তির সঙ্গে মানুষের তৈরী যন্ত্রের প্রতিযোগিতা লেগে গেল। বাজীটা সমান সমানই: নেকড়ে যদি হারে, তবে তার প্রাণের বিপদ। আমরাও সেই বিপদের ঝুঁকি নিলাম: রাস্তায় যদি কোন গর্ত থাকে, চাকার তলে হঠাৎ যদি কোনও পাথর পড়ে,— গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

মসৃণ রাস্তায় ভীষণ জোরে গাড়ি চালান যায়। নেকড়েটার চেয়ে আমাদের আরেকটা সুবিধা ছিল: ক্লান্ত হবার ভাবনা আমাদের নেই, পেট্রলও প্রচুর পরিমাণে আছে।

কিন্তু নেকড়েটার হাতেও তুরুপের তাস ছিল। রাস্তাটা মোটেই পুরোপুরি মসৃণ নয়। একেক জায়গায় ভাঙা পাথরের স্তূপ, একেক জায়গায় গর্তের ঝাঁকানি। নেকড়ের তাতে কোনও অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদের গাড়ির গতি তার ফলে কমে আসছিল।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ আর আমি সামনের আসনের পিঠটা চেপে ধরে নিজেদের সামলে রাখছিলাম। আমাদের চোখ কেবল নেকড়ের ল্যাজ আর স্পিডোমিটারের সাদা ডালার কম্পিত কালো হাত—এই করছিল। আমরা কেবল দর্শকমাত্র, যদিও আমরা চালকের সঙ্গে তাড়া করে চলেছি, আমাদেরও প্রাণের ভয় কিছুমাত্র কম নয়।

সবকিছুই পেত্যা নোসিকের কেরামতির উপর নির্ভর করছে।

নেকড়েটা ছুটে চলল, দেখে মনে হচ্ছিল না যে খুব জোরে দৌড়চ্ছে। কিন্তু সেটা চোখের ভুল, কারণ স্পিডোমিটারের কাঁটাটা কুড়ি থেকে এক লাফে চল্লিশে উঠে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল।

তার মানে আমরা ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে চলেছি, সবচেয়ে ভাল রেসের ঘোড়া এরকমই দৌড়য়।

নেকড়েটা একই ভাবে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মাঝখানের দূরত্ব মোটেই কমছে না।

—আরও জোরে। আরও জোরে।—ভীক্তর স্তেপানভিচ্ দাঁত চেপে বলল।

পেত্যা একসিলারেটরের উপর পা দিয়ে আরও জোর চাপ দিল।

নেকড়েটা একইভাবে দৌড়ে চলল—একবার ফিরেও তাকাল না। তার উপায়ও নেই: নেকড়ের শিরদাঁড়া আর ঘাড় এমনভাবেই তৈরী। কিন্তু আমরা কোনখানে তা সে নিশ্চয়ই জানত: দৌড়নোর গতি বাড়িয়ে দিয়ে গাড়ির সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিল।

গাড়িটা গোঁ গোঁ করছে, ঝাঁকানি খাচ্ছে। আমাদের যেন জ্বরের কাঁপুনি ধরল।

—ও-ও, যাঃচ্চলে।—ভীক্তর স্তেপানভিচের মুখ দিয়ে একটা আর্তস্বর বেরল। নেকড়েটা দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে।

একটু পরেই রাস্তার অবস্থার উন্নতি হল, আমাদের চলার গতিও আবার বাড়ল।

—তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!—ভীক্তর স্তেপানভিচ্ যেন প্রলাপের ঘোরে বলেই চলল।

গাড়ি আর নেকড়ের ল্যাজের মাঝের দূরত্ব যে কমেছে, তা বেশ বোঝা গেল। গাড়িটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে অমঙ্গল ঘোষণা করল, কিন্তু পেত্যা সে দিকে নজর দিল না।

নেকড়েটার ল্যাজের মোটা ঘন ফার আমরা বেশ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ ভীক্তর স্তেপানভিচ্ ধুপ করে তার আসনে বসে পড়ল।

—আস্তে চল, নোসিক্। — তার গলার স্বর, কথার ধরণ একেবারে বদলে গেছে।— সজীব মাংস-পেশী কখনও যন্ত্রের সঙ্গে লড়তে পারে না।

মনে হল, এই প্রতিযোগিতায় তার আর কোনই উৎসাহ নেই। এমনকি তার গলার স্বরে জন্তুটার প্রতি কিছু করুণার আভাসও ফুটে উঠেছিল।

ওর মনের ভাব আমি বুঝতে পারছিলাম — আমারও জন্তুটার জন্য একটু খারাপ লাগছিল। কিন্তু পেত্যা দার্শনিক গোছের ছেলে নয়। ও গাড়ির জোর আরও বাড়িয়ে দিল।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ আর আমি সামনের আসনটা আরও জোরে চেপে ধরলাম, কখন আবার ঝাঁকানি খাই সেই ভয়ে পা দিয়ে নিজেদের সামলে রাখলাম: এখন সামনে ছিটকে পড়ে, গাড়ির তলায় হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবার শব্দ শোনার সম্ভাবনা রয়েছে।

নেকড়েটা তখন প্রায় কুড়ি পা আগে।

হঠাৎ পেত্যা স্টীয়রিং হুইলটা ঘুরিয়ে দিল: রাস্তাটা একপাশে ভীষণ বেঁকে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য এক চিলতে আলো স্তেপের বুক চিরে চলে গেল। নেকড়েটাও সেই পথে দৌড় মারল। আমরা ঘুরে গেলাম, আলোটা আবার রাস্তায় পড়ল। কিন্তু নেকড়ে তখন আর ছিল না।

— পালিয়েছে!— পেত্যা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রতিযোগিতাটার কোনও মীমাংসা হল না। মারাত্মক লড়াইটা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মাঝখানে থেমে গেল।

পেত্যা গাড়িটার গতি কমিয়ে জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

কেউ একটি কথাও বলল না।

চারিদিক খুঁজে দেখে আমাদের গন্তব্যস্থল বের করে গাড়িটা থামালাম।

আমরা গাড়ি থেকে নামার পর, শিকার শেষে যেখানে বসে বিশ্রাম করেছিলাম, সেই জায়গাটায় পেত্যা গাড়ির আলোটা ফেলল।

তিনজনেই খুব ভাল করে ঘাস আর নালাটা খুঁজে দেখলাম, কিন্তু সিগারেট কেস্‌টা পাওয়া গেল না।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ বিশ্বের বিষাদ নিয়ে গাড়িতে উঠল। আমরা ফিরলাম।

— একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না,— অধ্যাপক বলল,— এটা ত আগেই পাওয়া যেতে পারত।

—কোনটা? সিগারেট কেস্‌টা?

—কোন সিগারেট কেস্‌? না, পালাবার পথটা। নেকড়েটা ত রাস্তা ছেড়ে ঘুরে গেলেই আমাদের কাছ থেকে পালাতে পারত। তার মানে নেকড়ে কোন দিকে যাবে, সেটা কোনও পথ অনুসারে নির্দিষ্ট নয়। ও কেবল সোজা, নাক বরাবর দৌড়েই চলে, দৌড়েই চলে।

—ভীক্তর স্তেপানভিচ!—পেত্যা নোসিক্‌ হঠাৎ বলল।—সিগারেটটা কোথায় পেলে?

—কোন সিগারেট? ও, এইটে? টুপীর ভিতর থেকে। টুপীটা মাটিতে পড়ে যেতে সিগারেটগুলো সব ছিটকে বেরিয়ে গেল।

—একবার ত খুঁজে দেখ। সিগারেট কেস্‌টাও হয়ত ওখানেই রয়েছে?

ভীক্তর স্তেপানভিচ্‌ টুপীটা তুলে নিল।

—তাই ত, এখানেই রয়েছে... তার মানে আমি টুপীর মধ্যে পুরে রেখেছিলাম... আর এই ত পাস্‌টা—কী আশ্চর্য। শুধু শুধু এতটা সময় আর পেট্রল নষ্ট করলাম?

—ভীক্তর স্তেপানভিচ্‌, তুমি একটি নেকড়ে বাঘ,—আমি উত্তরে বললাম।

অধ্যাপক চমকে উঠল।

—নেকড়ে? কী বলতে চাও তুমি?

—শুধু এই বলতে চাই, পাস্‌টা পাবার জন্য একটু হাতটা বাড়ালেই হত, কিন্তু তার বদলে তুমি সারারাত স্তেপের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চললে। নেকড়েটাও ঠিক তাই করেছিল। ওর পাস্‌টাও ওর পকেটেই ছিল—রাস্তা থেকে পাশে নেমে পড়লেই তার বিপদ কেটে যেত।

নালাটা পেরিয়ে গেলেই গাড়িটা আর তাকে ধরতে পারত না।

কিন্তু জন্তুটা গাড়ির আলোয় রাস্তা ধরেই দৌড়তে থাকল, যেন অলিন্দ দিয়ে চলেছে। দুপাশের ধারালো অন্ধকার আকাশে ওঠা দুর্ভেদ্য দেয়ালের মত নেকড়েটাকে আটকে রেখেছিল।

নেকড়েটা বুঝতে পারেনি যে এই বাধাটা আসলে তার মনের ভুল, পাশ ফিরলেই হয়ে যায়...

—বুঝতে পেরেছি।—ভীক্তর স্তেপানভিচ্‌ বলল।—ঠিক বলেছ—আমি নেকড়ে বাঘই বটে।

সুন্দর হ্রদ সারীকুল

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ আর আমি যখন বিরাট সারীকুল হ্রদের তীরে এসে পৌঁছলাম, তখন স্তেপের কালো খড়ের গাদাগুলো আকাশের গায়ে ঝাপসা হয়ে গেছে।

— তবে এইটেই পুবদিক হবে,— অধ্যাপক ভোরের কমলা রঙের ছোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল। — আমরা দক্ষিণ তীরে রয়েছি, এখন সোজা উত্তরে যাব। সূর্যটা আমাদের ডাইনে উঠছে। যাই হোক, আমার কাছে একটা কম্‌পাস্ আছে।

আমাদের দোনলা বন্দুকদুটো কাঁধে ছিল। গুলির বেল্টটা পুরো রয়েছে, পকেটেও গুলি ভরা — বেশ ভাল শিকার আশা করছিলাম। শরতের শ্রান্তি-দূর-করা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল।

নলখাগড়া একেবারে যেন তীর থেকেই উঠেছে, তাদের মাঝখানেও খুব কম জলই রয়েছে। জায়গাটা অন্ধকার, সে অন্ধকার নানা সজীব শব্দে পূর্ণ — নলখাগড়ার সরসর শব্দ, জল আছড়ে পড়ছে, পাক খেয়ে আকাশে উঠতে উঠতে একটা অদৃশ্য হাঁস জোরে ডেকে উঠল — চারিদিক থেকে তার ভীত সাথীদের সরব উত্তর।

এই সময়টার, এই ভোর হওয়ার সত্যিই একটা উত্তেজনা আছে।

অন্ধকার দ্বীপের মত নলখাগড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঝিলকে ওঠা জলের কাঁপুনি দেখা যায়; বেশ বুঝতে পারা যায় জায়গাটা নানা শিকারে ভরে আছে, কিন্তু গুলি করার উপায় নেই: সেই অল্প আলোয় পাখিরা সব অদৃশ্য, এমনকি পনেরো হাত দূরেও দেখা যায় না।

কাজেই অন্ধকার থাকতে থাকতেই তীর থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে সময়টাকে কাজে লাগানই ভাল। হ্রদের যত ভিতরে যাওয়া যাবে, ততই বেশি শিকার পাব। আর বিপদের ভয়ও কিছু নেই, হাঁটু জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটা যায়। এখানে ওখানে একটু কম বেশি হতে পারে, কিন্তু গর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়া বা কোথাও হোঁচট খাবার কোনও ভয় নেই। যদি অসাবধানী হও, তবে বড় জোর কিছুটা উষ্ণ জল বুটের চওড়া মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে পারে।

সারীকুল হ্রদ এই রকমই সদয়: একটা বিরাট প্লেট স্তেপের বুকে বসান। তীর ঘিরে নানা রকম জলজ ঝোপঝাড় আর তার মধ্যে মাইলের পর মাইল জল শুধু জল — সত্যিই যেন সমুদ্র।

হ্রদটা খুব শান্তও। বাতাসের চাবুকে সেই অগভীর জলে বড় ঢেউ উঠতে পারে না। আর যদিও বা ওঠে, তবে ঢেউটা ঘন নলখাগড়ার জঙ্গলে জালে পড়া মাছের মত আটকা পড়ে, ছোট ছোট বৃত্তে ভেঙে, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে।

মোট কথা এমনই সমুদ্র যেখানে চেষ্টা করলেও ডোবা যায় না।

দিনটা এত আস্তে আস্তে আসছে কেন? একঘণ্টা ধরে হাঁটছি তবুও এখনও গুলি করার পক্ষে বেশ অন্ধকার।

— ভীক্তর স্তেপানভিচ!

— কী হল?

— থেমে একটা সিগারেট খেয়ে নেওয়া যাক।

— ঠিক কথা। সময়টা ত কোনওভাবে কাটাতে হবে।

দেশলাই জ্বলে ওঠার পর অন্ধকারটা আরও ঘন হয়ে উঠল। সিগারেটের আগুনে দেখতে পেলাম, ভীক্তর স্তেপানভিচ কী যেন খালি এ পকেট থেকে নিয়ে ও পকেটে রাখছে।

'টুপ!'

—কী একটা যেন ফেললে?

—স্-স্-স্।... শুনতে পাচ্ছ?

'প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক।' আওয়াজটা দূর থেকে এলেও, ক্রমশঃ জোর হয়ে উঠছে। বুনো হাঁসের দল। সঙ্গে সঙ্গেই সিগারেট জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

—এদিকে, আরেকটু ডাইনে ঘেঁষে!—অধ্যাপক হাঁসের দলের কাছে আসার জন্য পা ফেলল, কিন্তু দুঃখের বিষয় হাঁসগুলো তখনও অদৃশ্য। পাখিগুলো অন্ধকার আকাশে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে পার হয়ে চলে গেল।

—দাঁড়াও, তোমার কিছু একটা পড়ে গেছে। একবার খুঁজে দেখা যাক—এইখানেই নিশ্চয় হবে।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ ফিরে এল। কিন্তু হঠাৎ প্রায় তার পায়ের তল থেকে একটা হাঁস জোর পাখা নেড়ে উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে আকাশে লাফিয়ে পড়ল। অধ্যাপকের বন্দুকের নল দুবার ঝলক দিয়ে উঠল, তারপর তার বিজয়ধ্বনি শুনলাম:

—পেয়েছি, ব্যাটা পাজী!

—পেয়েছ?

—নিশ্চয়! তা আর বলতে!

—তবে এস, এখানে কী ফেললে খুঁজে দেখা যাক।

—আরে যাকগে। নিশ্চয়ই ছোট ছুরিটা হবে। দেখ, আমরা এখন শিকার সুরু করতে পারি। চল।

অদ্ভুত লোক আমার এই অধ্যাপকটি! বাড়িতে কেমন ধীর স্থির, বিচক্ষণ, কিন্তু শিকারে বেরলেই একেবারে অন্য মানুষ। ছোট ছেলের মত উত্তেজিত, সব কিছু ফেলে টেলে, একটা হাঁসের পিছনে দশ বার মাইল দৌড়বে।

আমরা এগিয়ে চললাম। বেশ আলো হয়ে গেছে, কাছে থেকে গুলি করা যায়।

আমি বন্দুকটা হাতে তুলে নিলাম। কয়েক মুহূর্ত পরেই হাঁসগুলো চলতে সুরু করবে, সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকটা আপনা থেকে ঠিক জায়গায় এসে যাবে, পাখির আবছা শরীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। এই মুহূর্তটির জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকতে হয়, ভয় হয় পাছে ঠিক সময়টা পেরিয়ে যায়, কিম্বা বন্দুকটা অদ্ভুতভাবে তুললাম বা ঠিকভাবে তাক করা হল না—হাঁস পালিয়ে গেল। যতই সাবধানে প্রস্তুত হয়ে থাক, হাঁস

কখনই সামনে থেকে উঠবে না, হয় পাশ থেকে উঠবে, নয়ত একেবারে পিছন থেকে।

ঐ, সুরু হয়েছে। হাঁসগুলো কখনও এখানে, কখনও ওখানে, কখনও বা একেবারে পায়ের তল থেকে পাক খেয়ে উঠতে সুরু করল। দলে দলে হ্রদের উপর চক্কর দিতে লাগল, শত শত — হাজার হাজার।

কন্‌কনে কুয়াসা জঙ্গলগুলোকে ভেজা আলখাল্লায় মুড়ে দিল। একঝাঁক দ্রুতডানা বালি হাঁস আর তার চেয়ে মন্থরগতি পাতিহাঁস বন্দুকের শব্দে ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় আমার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার হাত আর চোখ নিজে থেকেই যা করবার করল। পাখির দূরত্ব বা গতি বুঝতে পারার আগেই গুলি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হাঁসগুলোকে তুলে নিয়ে, বন্দুকে আবার গুলি ভরে, আহত পাখিগুলোকেও শেষ করলাম।

তারপর সময়ের কথা ভুলে গিয়ে যেদিক সেদিক হাঁটতে লাগলাম। অবশ্য যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে তাই আমার সঙ্গী কোন দিকে যায় সেটা খেয়াল রাখছিলাম।

চারিদিকে নলখাগড়ার জঙ্গল আর মাঝখানে পরিষ্কার জলে ভরা ছোট ছোট পুকুর বনের মাঠের মত। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে, এক মাঠ থেকে আরেক মাঠে আমরা এগিয়ে চললাম। যেখানেই যাই বিস্ময়কর একটা কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

নলখাগড়ার ঝোপে লুকিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। একটা কালো রঙের, ছুঁচলো ঠোঁট, হাঁসের মত বড় পাখি ঝোপ থেকে নেড়ামাথা চারিদিকে নাড়াতে নাড়াতে সন্তর্পণে সাঁতার কেটে বেরিয়ে এল, পাখিটার নাম কাশ্‌কাল্‌দাক্। তারপর আরেকটা এল, আরও, সব মিলিয়ে চারটে হল।

প্রজাপতির মত ডানা পিছনে তুলে ধরে একটা মস্ত খয়েরী রঙের শিকারী পাখি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঝোপের উপর দিয়ে উড়তে সুরু করল।

পাখিটা নিশ্চয়ই নেড়ামাথা হাঁসটাকে লক্ষ্য করেছিল, কারণ সোজা নেমে এসে, ডানাদুটো প্রায় থামিয়ে দিয়ে ঝোপের উপর উড়তে থাকল।

কাশ্‌কাল্‌দাক্‌টাও শিকারী পাখিটাকে লক্ষ্য করেছিল। গোঙাতে গোঙাতে, কাঁদতে কাঁদতে ঝোপের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে গেল, তার সাথীরাও তার অনুসরণ করে চলল।

শিকারী পাখিটা জলের উপরে এক চক্কর মেরে শেষ পর্যন্ত, ছাই রঙের যে বিরাট, কুঁজো বকটা অবিচলিতচিত্তে জলে হাঁটু ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার উপরেই গিয়ে পড়ল।

কিন্তু তার পক্ষে বকটাকে কায়দা করা কঠিন। বকটা তলোয়ারের মত ঠোঁটদুটো তার দিকে ফেরাতেই, শিকারী পাখিটা সোজা উপরে উঠে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানে উড়ে এল।

বকটা মনে হল আবার ঘুমতে লাগল — লম্বা গলাটা গুটিয়ে গিয়ে পিঠ আর বুকের উপরে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত হয়ে রইল, লম্বা ঠোঁটটা জলের দিকে বেরিয়ে রইল।

প্লপ্ — নিমেষের মধ্যে গলাটা ভাঁজ খুলে ঠোঁটটা শক্ত হয়ে উঠে বর্শার মত জল ফুঁড়ে ফেলল। এক মুহূর্ত পরে ঠোঁটটা উপরে তুলে খুলল, একটা রূপোলি মাছ চক্‌মক্ করে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিকারী পাখিটা খুব কাছ দিয়েই উড়ছিল। আমার হাত আর চোখ যন্ত্রচালিতবৎ যা করবার করে ফেলল।

বড় বকটাও বিরাট শরীরটা নিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার কাপড়ের মত ডানাগুলো আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে ঝোপের ভিতর থেকে আকাশে উঠল, খাড়া খাড়া ঠ্যাংগুলো পিছনে ছড়ান।

এইবার। হাত আর চোখ হাতে হাত মেলাল।

বকটা মারার ইচ্ছা ছিল না : ওটা দিয়ে কী হবে? কিন্তু আমার হাত আর চোখ স্বাধীনভাবেই কাজ করল : চওড়া গোল ডানা মেলে, তলোয়ারের মত ঠোঁটদুটো আমার দিকে ভয়াবহভাবে উঁচিয়ে বকটা জলের উপর পড়ে রইল।

এই হাঁস মারার ক্ষেপামিতে আমার আর কোনও কিছুই খেয়াল ছিল না। এর মধ্যেই অনেক বন মুরগী জোগাড় করেছি — আর বেশি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। এবার ক্ষান্ত দেওয়া উচিত। ঐ — অধ্যাপকের বন্দুকের আওয়াজ। সেও জগৎসংসার সব ভুলে গেছে দেখছি।

— এই, ভীক্তর স্তেপানভিচ্!

— কী?

— আজ শেষ করলে কেমন হয়? একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।

— ঠিক হ্যায়!

অধ্যাপক এল, সব উস্‌কোখুস্‌কো, মাথায় টুপী নেই।

—টুপী কোথায় গেল?

—টুপী? হুম্‌!... পকেটেই হবে হয়ত... না, নেই ত... কী করে হারাল কে জানে।

অধ্যাপক প্রাণ খুলে হেসে উঠল। ডজনখানেক হাঁস যখন পাওয়া গেছে, আর পকেটে তখনও যখন গুলি ভর্তি, তখন আর টুপী নিয়ে কী হবে।

এখন বসে, মুরগীর ঝোলাগুলো নামিয়ে ক্লান্ত পাদুটোকে জিরোতে দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু আমরা তখন হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে, হ্রদের মধ্যে কোনও দ্বীপও কোথাও নেই।

অধ্যাপক একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ এখানেই শেষ করা ভাল। সূর্যটা কোথায়?'

সত্যিই ত, কোথায় সূর্য? তখনই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে সারা সকাল সূর্যের মুখ দেখিনি। ভোরের আভা অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে, আকাশটাকে ঘন ধোঁয়াটে গোল কাঁচের মত দেখাচ্ছে, আলোর অদৃশ্য উৎসটিকে ঢেকে রেখেছে।

মেঘ নয়, একটা ঘন আবছায়ায় আকাশ ঢেকে গেছে—বোধ হয় জল থেকে ওঠা কুয়াসা কিম্বা দূর উরালের কোনও দাবানলের ধোঁয়া। সূর্য কোথায় তা ঠিক করা অসম্ভব।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্‌ একটু ভীত হয়ে বলল, 'কম্‌পাস্‌ দেখতে হবে।'

তারপর পকেটগুলো খুঁজতে থাকল। অধ্যাপকের কোটে অনেকগুলো পকেট, তাই খুঁজতে পুরো পাঁচ মিনিট লাগল।

একেবারে নিশ্চিত হবার জন্য অধ্যাপক আরেকবার কাজে লেগে গেল।

আমি আমার টুপীটা বাড়িয়ে ধরলাম, আর ও পকেট থেকে একটার পর একটা জিনিস বের করে তার উপর সযত্নে রাখতে লাগল।

অধ্যাপকের পকেটে সবরকম জিনিস ছিল, ঘড়ি, ছুরি থেকে সুরু করে ছোট্ট পুতুলের জুতোও কী করে যেন ঢুকে গেছে, আর আঠার শিশি, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, পালক।

এক কথায়, সবকিছুই আছে, কম্‌পাস্‌টা বাদে। অধ্যাপক হতভম্বের মত আমার দিকে তাকাল।

জলের দিকে দেখিয়ে বললাম: 'টুপ—মনে আছে, যখন অন্ধকার ছিল?'

—হুম্‌!... সেটাই হতে পারে। আমি ভাবলাম বুঝি ছুরিটা।

চারিদিকটা একবার হতাশ চোখে দেখে নিয়ে, আমার দিকে গম্ভীরভাবে তাকাল।

— তোমার মনে পড়ছে?...

— হ্যাঁ, সেই হিসাবনবীশের কথা মনে পড়ছে। এই হ্রদেরই তীরবর্তী এমাঞ্জেলিংকা সহরে গল্পটা শুনেছিলাম। গল্পটা ছোট্ট আর তার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট।

হিসাবনবীশ অবসর সময়ে হ্রদে ঘুরে ঘুরে হাঁস শিকার করতে ভালোবাসত। একদিন সে আর আপিসে এল না: ঘরেও পাওয়া গেল না। শেষ তাকে বন্দুক ঘাড়ে করে হ্রদের দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল।

দিন পনেরো পরে কয়েকজন জেলে নলখাগড়ার গায়ে বাঁধা একটা কাগজ দেখতে পায়। মরা, পচ্-ধরা হাঁস চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছিল, আর নিচে, অল্পজলে ভাল করে ঢাকাও পড়েনি, লোকটি শুয়ে আছে তার বন্দুক নিয়ে। কাগজটায় হিসাবনবীশের পাকা হাতের লেখা রয়েছে: 'আট দিন ধরে কেবল ঘুরছি। উত্তর দক্ষিণে যাবার চেষ্টা করেছিলাম — কিন্তু কেবল নলখাগড়ার বন। কাঁচা হাঁস খেয়ে কাটিয়েছি। গুলি সব ফুরিয়ে গেছে। আমি ভীষণ ক্লান্ত। আর পারলাম না।'

অধ্যাপক নিচ গলায় চিন্তিতভাবে বলল, 'কেবল নলখাগড়ার বন। নলখাগড়া আর জল।'

জল আস্তে আস্তে আমাদের জুতোর উপর ছলাৎ ছলাৎ করে পড়তে লাগল। যতদূর দেখতে পাচ্ছি হলদে নলখাগড়ার মাঝখানে জল, আর তাতে মাছরা উল্লাসে লাফাচ্ছে।

এটা যদি বন হত! বনের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ খুঁজে বের করা খুব সহজ, তার সুপ্রচলিত পথ হল, গাছের গায়ে কোন দিকে বেশি শ্যাওলা পড়েছে লক্ষ্য করা, নয়ত পিঁপড়ের বাসা, এমনকি পাখির বাসা দেখেও ঠিক করা যায়।

আমি শেষ কালে বললাম: 'এখন যেতে হয়। ঠিকমত স্মরণ হলে, এই দিক থেকেই আমরা এসেছিলাম।'

— আর যদি ঠিকমত না হয়, — অধ্যাপক শান্তভাবে জুড়ে দিল, — বেচারী হিসাবনবীশের যা হয়েছিল আমাদেরও তাই হবে। একটু দাঁড়িয়ে ভেবেচিন্তে দেখা যাক।

ভাববার আর কী আছে? আমরা পাঁচ ছ'ঘণ্টা হেঁটে তীর থেকে অনেকদূর চলে এসেছি। ঠিক পথে গেলেও রাত্তিরের আগে বাড়ি পৌঁছতে পারব না।

তার চেয়ে বরং যেখানে আছি সেখানে থাকাই ভাল? সন্ধ্যার দিকে হয়ত সূর্য দেখা যেতে পারে, আকাশটা অন্ততঃ রাত্তিরেও পরিষ্কার হয়ে গিয়ে তারা দেখা দেবে। ছোট

সপ্তর্ষির লেজের কাছে ধ্রুবতারা দেখা যেতে পারে। সকালবেলা সূর্যের মুখ দেখলে কী ভালই না লাগবে! এই সময়টা কাঁচা হাঁস খেয়েই চালাতে পারি।

— ঠিক আছে। ভুল পথে না এগিয়ে এইখানেই সূর্য বা তারার জন্য অপেক্ষা করে থাকা ভাল।

কিন্তু আমার কথা অধ্যাপকের কানেই গেল না, যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে, তার তখন এমনি ভাব। নিঃশব্দে জলের দিকে তাকিয়ে রইল, ঠিক মাছরাঙা যেভাবে চুপ করে ধ্যানের ভাণ করে মস্ত তীক্ষ্ণ ঠোঁট নামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেইভাবে।

— ইউরেকা! — অধ্যাপক হঠাৎ জেগে উঠে, কপাল চাপড়ে বলল। — পেয়েছি! এই ঝামেলা থেকে আমাদের উদ্ধার করা তোমারই কাজ। পাহাড় হলে আমি করতাম, কারণ ধাতুর ব্যাপার হল আমার বিষয়, আমি ঠিক তা থেকেই কিছু একটা সূত্র খুঁজে বের করতাম। মোট কথা, যেটা আমাদের জীবিকা তার জ্ঞান সব সময়েই আমাদের কাজে লাগান উচিত, বিশেষ করে বিপদের সময়। তোমার জ্ঞান তুমি এবার কাজে লাগাও, তবেই আমরা বাঁচতে পারি।

— বক্তৃতাটি চমৎকার হয়েছে, — একটু রুক্ষভাবেই বললাম। — কিন্তু তবুও শুকনো তীরে আগুনের পাশে বসে ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের সঙ্গে শুনতেই ভাল লাগত। আমি যা নিয়ে কাজ করি সে বিদ্যের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

— পাখি, — অধ্যাপক অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক সুরে বলল।

— পাখি?

পাখির কথা এর মধ্যে আসে কী করে? ওর বক্তব্যটা কী?...

তারপরেই কথাটা মনে পড়ল। এত সহজ!

— চমৎকার! — উল্লাসে বলে উঠলাম। — এখন আমি বক্তৃতা দেব, তবে অবশ্য তোমায় দক্ষিণে বাড়ির পথে সোজা নিয়ে যেতে যেতে।

কিছুক্ষণ মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখির ঝাঁকগুলোকে দেখে নিয়ে দিক ঠিক করে, নিশ্চিন্ত মনে চলতে সুরু করলাম। পথ দেখিয়ে চলতে চলতে বেশ ভারিক্কী চালে, আমার কাজের সব বিদ্যে জাহির করে বক্তৃতা দিতে লাগলাম। ভীক্তর স্তেপানভিচ্‌কে সব অত্যন্ত জানা কথাই আবার শোনালাম, যেমন, শরতে অনেক জাতের পাখি দল বাঁধে আর যাযাবর পাখির দল উত্তরের বাসা ছেড়ে দক্ষিণে উড়ে যায়।

মাথার অনেক উপর দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে হাঁসের দল উড়ে যাচ্ছিল। একবার, একটা বকের ছাই রঙা ঝাঁক খুব ধীরে ধীরে উড়ে গিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল তখন আর হাঁস মারবার কোনও ইচ্ছে ছিল না। আমরা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাদের উড়ে যাওয়া লক্ষ্য করে চললাম।

চার ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে জলের ভিতর দিয়ে হেঁটে চললাম, শেষের দুঘণ্টা নিঃশব্দে। সূর্য দেখা দেয়নি, কোনখানে তীরের কোনও চিহ্নও দেখলাম না।

দিনের সময় অনুসারে পাখিদের ওড়ার কায়দারও পরিবর্তন হয়। একাধিকবার লক্ষ্য করে দেখেছি, কী কারণে জানি না কাক আর বাজ ভোরবেলা আর গোধূলির সময়ে ডানা বেশি নিচে না নামিয়ে দ্রুত নাড়ায়।

একটা যাযাবর বাজ আমাদের কাছ দিয়েই উড়ে গেল। দেখলাম ওড়ার ধরণটা সন্ধ্যার সময়ের মত।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ও নিজে দেখে ঠিক করল যে রাত্রি আসছে।

—শীগ্গীরই অন্ধকার হয়ে যাবে,—বিষণ্ণভাবে বলে অধ্যাপক দাঁড়িয়ে গেল।—আমি আর যাব না।

—এত ক্লান্ত?

—না, তোমার ঐ পাখিতে আর নির্ভর করতে পারছি না। ঠকিয়েছে—কোথায় ভুলটা হয়েছে বলছি।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে চলল:

—একথা ঠিক, অনেক পাখিই সাধারণতঃ স্থান পরিবর্তনের সময় উত্তর থেকে দক্ষিণে যায়। কিন্তু ঝাঁকের পাখি কখনো সোজা পথে দক্ষিণে যায় না। তারা অন্য পথে ঘুরে ঘুরে যায়। এই বিরাট হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে যেকোনও পথই নিতে পারে, আর সত্যি তাই করে থাকে। হাঁসের দল এইখানে খেতে আসে। অনেকক্ষণ থেকেই সোজা যাচ্ছি কিনা লক্ষ্য করছিলাম। আমার মতে আমরা সোজা যাচ্ছি না। কেবল গোল হয়ে ঘুরছি, এক ঘণ্টা আগে তীরের যত কাছে ছিলাম এখন হয়ত তার চেয়ে দূরে সরে গেছি।

সত্যি বলতে কি, এই ভয়াবহ ভাবনা আমার মনেও একাধিকবার এসেছিল। তবুও নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করলাম।

—বড় বকের ত এখানে খাবার মত কিছুই নেই। তাদের এই হ্রদে নামার কোনও কারণ নেই, সোজা উড়ে চলে যাচ্ছে—উত্তর থেকে দক্ষিণে।

—কিন্তু তীরের সেই ঘাসের গাদাগুলো কেন দেখতে পাচ্ছি না?

তার উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি সত্যিই দক্ষিণে যেতাম, তবে অনেক আগেই তীরে পৌঁছে যাবার কথা।

হতাশভাবে চারিদিকে তাকালাম। জল আর নলখাগড়া, আরও জল আরও নলখাগড়া। আর খালি নানা দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া আবার পেছিয়ে আসা হাঁসের দল। আরেক ঝাঁক আমাদের দিকে দ্রুত উড়ে এল — কী পাখি বুঝতে পারলাম না।

কাছে এগিয়ে আসতে আমি বন্দুক তুললাম। চোখ আর হাত তাদের যথাকর্তব্য করল। এবার মনের সাহায্যও ছিল: সাবধানে দূরত্ব আর গতি খেয়াল রেখে টিপ করেছিলাম।

মারাত্মক সীসার টুকরোটা দলের একটার যাত্রার সেইখানেই সমাপ্তি ঘটাল, পাখিটা জলে পড়ল, যেন একটা লোমের বল।

তুলে নিয়ে অধ্যাপককে দেখালাম।

— সাইবেরিয়ার জে, কাকজাতীয় পাখি। কেন মারলে? তোমার কি একটুও দয়ামায়া নেই, জানোয়ার না কি?

ঠিকই বলেছে। পাখিটা সাইবেরিয়ার জে, উস্কোখুস্কো এলোমেলো পালক বাদামী আর জাম রঙে মেশান, আকারে কালো বুলবুলির সমান, মাথায় ঝুঁটি।

— না, প্রিয় অধ্যাপক মশাই, — আমি বললাম, — ভুল করেছ। এটা জে নয়, টিয়াপাখি। যদিও টিয়া সাধারণতঃ উত্তরের দিকে থাকে না, আমাদের পক্ষে এটা একটা খাঁটি টিয়ার মত।

— বুঝতে পারছি এত কষ্ট তোমার সহ্য হচ্ছে না। ভয়ে আর ক্লান্তিতে মাথা বিগড়ে গেছে, — ভীক্তর স্তেপানভিচ্ বলল, খুব যে ভদ্রভাবে বলল তা নয়।

— না, অধ্যাপক, মাথা আমার ঠিকই আছে। তুমি যদি আমেরিকা আবিষ্কারের গপ্পটা শোনার মত পথটুকু আমার সঙ্গে হাঁট, তবে তার প্রমাণ পাবে।

— একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছ, — অধ্যাপক রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল। কিন্তু আমার পথ অনুসরণ করতেও ছাড়ল না।

আমি বক্তৃতা সুরু করলাম:

— ক্রিস্টোফার কলম্বস রাণী ইসাবেলাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি সেই উপকথার রাজ্য আন্তিলিয়া আবিষ্কার করতে চলেছেন, যেখানে ধুলোর চেয়ে সোনার পরিমাণ বেশি। রাণী তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলম্বস নিজেও কোথায় চলেছেন জানতেন না।

মহাসমুদ্রের এক অজানা দিকে কলম্বস নৌকোগুলো চালালেন, মাঝিমাল্লারা ক্লান্তিতে

ভেঙে পড়ল। তারা সব গুজ্‌গুজ্‌ করতে লাগল, বিদ্রোহের ভয় দেখাল। কলম্বস ডেকে উঠে স্পেনের দিকে নৌকো ফেরাবার হুকুম দিতে যাবেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল এক ঝাঁক পাখি: টিয়াপাখির দল, নৌকোর উপর দিয়ে গা ঘেঁষে চলেছে। ব্যাপারটা দেখে তাঁর মত বদলে গেল, পাখির দলকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। একঘণ্টা পরে যে মাল্লার উপরে চারিদিকে নজর রাখার ভার ছিল সে চেঁচিয়ে উঠল: 'মাটি দেখা যাচ্ছে!' সবাই দেখল সত্যিই তাই।

ভীক্তর স্তেপানভিচ্ রেগে উঠে বলল, 'এত খুবই স্বাভাবিক। টিয়া হল খাঁটি বনের পাখি — মহাসমুদ্রে সে আসতে যাবে কেন? তীরের দিকে উড়তে সে বাধ্য। যেকোনও বোকাও তা জানে।'

আমি বললাম, 'আমাদের এই ছোট্ট বনের কাক, সাইবেরিয়ার জে'ও মাটির পাখি, এরকম বিরাট হ্রদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। ঝাঁকটা কোনও একটা ছোট খাড়ি পার হয়ে তীরের দিকে যাচ্ছিল। সে তীর, আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে যদি তাকাও তবে তুমি নিজেও দেখতে পাবে।'

অধ্যাপক সত্যিই তাকাল তারপরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল:

কলম্বসের সবে জয় গাও,
সাগরের সাহসী নাবিক সে।
তার আবিষ্কারের কল্যাণেতেই
এই হতভাগা পথচলার অবশেষ!

সামনে, জলের ঝোপঝাড়ের ওপারে সন্ধ্যার দ্রুত নেমে আসা ছায়ায় দেখা যাচ্ছে খড়ের গাদার গোল চূড়াগুলো।

জুল্‌বার্স

(ভরশীলভ ব্যাজ পাওয়া একজন বন্দুক ছুঁড়িয়ের বলা)

গত শরৎকালে তাজিকিস্তানে আমার কিছু কাজ ছিল।

কাফেতে খাবারের অপেক্ষায় বসে আছি। এমন সময় কয়েকটি ছোকরা মিলিটারী অফিসার হাসতে হাসতে আর বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল।

তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলল। কথায় কথায় বেরল লেনিনগ্রাদে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে অন্য সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, আমরা দুজনে যে বন্দুক ছোঁড়ায় ভরশীলভ ব্যাজ্ পেয়েছিলাম সেকথাও অন্য অফিস্যারদের সে জানাল।

সকলে একসঙ্গে বসে খেলাম, শুনলাম এরা সবাই দলবেঁধে 'জুলবার্স' নামে একজাতের জন্তু মারতে চলেছে: জানোয়ারটা আশেপাশের গ্রামে গোরু ভেড়া মেরে সর্বনাশ করছে। প্রত্যেক শিকারীর জন্য একটা করে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে রাখা হয়েছে; তাদের একজনের অসুখ হওয়ায় আমাকে তার জায়গাটা নেবার জন্য সবাই পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমার জন্যও বন্দুক আর ঘোড়া থাকবে।

আমার ধারণা ছিল 'জুলবার্স' হচ্ছে একধরণের এ অঞ্চলের 'বার্স'—মানে প্যান্থার। ভয়াবহ কিছু নয়—একটা বড়সড় গোছের বিড়াল বললেই হয়। আর ওরাও সবাই এমন ধরে বসল যে না বলা সম্ভব হল না। ওরা বোঝাল, কিছু না হোক এই শিকারের ফলে একটা বন্য জন্তুর হাত থেকে লোকেরা রেহাই পাবে।

আমরা চললাম। সহর পেরিয়ে স্তেপের মধ্যে দিয়ে দুমাইল ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে, আমরা থামলাম।

আমায় একটা গুলি ভরা বন্দুক দিয়ে ট্রেঞ্চ দেখিয়ে দেওয়া হল। আমি ঢুকে পড়লাম। অন্যেরা চলে গেল, যে যার ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সৈন্যরা আমাদের ঘোড়া নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল।

আমায় বলা হয়েছিল জানোয়ারটা আশা করা যায় আরও ঘণ্টাখানেক পরে বেরবে, আমাদের তৈরী হয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট সময়।

ট্রেঞ্চটা একটা সাধারণ গর্ত, বুক পর্যন্ত গভীর। মাথা আর কাঁধ বেরিয়ে থেকে গুলি ছোঁড়ার সুবিধে হয়েছে। এক কোণে গর্তটা গভীর, মাথা টাথা শুদ্ধ একটা মানুষ ঢুকে যেতে পারে।

তখনই কেবল আমার খেয়াল হল যে জানোয়ারটা নিশ্চয়ই বেশ বিপজ্জনক হবে। যদি ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় তবে এই সংকীর্ণ গর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়লে জানোয়ারটার হাত থেকে বাঁচা যাবে। কী দরকার ছিল বাপু এই ব্যাপারে রাজী হওয়ার,

দিব্যি শান্তিতে থাকতে পারতাম, মাথার উপর একটা আচ্ছাদন থাকতো, মশার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না।

নানারকম সব চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগল : এই 'বার্স', না 'জুল্‌বার্স' যাই হোক না কেন, নিশ্চয়ই সিংহ নয়, কিন্তু আমি এসবে অভ্যস্ত নই, ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। জানোয়ারটা শুধু ছাগল কেন, বেশ বড়সড় বুনো শুয়োরও মারতে পারে। বুনো শুয়োর একবার দাঁত বসাতে পারলে যেকোনও লোকের পা ভেঙে দুটুকরো করে ফেলতে পারে।

বন্দুকটা ভাল করে পরীক্ষা করে নিলাম। সবকিছু ঠিক আছে।

চারিদিকে তাকিয়ে একটা মালভূমি চোখে পড়ল। ছোট ছোট ঘাসে ভরা, কিন্তু প্রায় দু'শ পা দূরেই অজস্র 'তুগাই', তার মানে ঝোপঝাড়ের ঘন জঙ্গল। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলাম কাছের ট্রেঞ্চগুলোয় শিকারীদের মাথা বেরিয়ে রয়েছে, আর বন্দুকের নল ঝক্‌মক করছে। কিন্তু ওরাও বেশ দূরে : জানোয়ারটা যদি আমায় আক্রমণ করে তবে ও পক্ষ থেকে সাহায্যের আশা করে কোনও লাভ নেই।

ঠিক একঘণ্টা পর, সামনে বহুদূরে, বন্দুকের শব্দ শুনলাম। বীটারের দল কাজ সুরু করেছে তার সংকেত, আগে থেকেই এটা ঠিক করা ছিল।

আকাশের অনেক উঁচুতে চক্রাকারে ওড়া শিকারী পাখির ভয়াবহ চীৎকার আর আমার পকেটের ঘড়ির শব্দ ছাড়া, চারিদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

বেশ কিছুক্ষণ বন্দুক উঁচিয়ে ধরে 'তুগাই'এর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। ঐ একটা কী জন্তু যেন ঝোপ থেকে মুখটা বার করে চারিদিক দেখে নিয়ে আবার ঢুকে গেল না? নাকি এ আমার কল্পনা?

অন্ততঃ একশ বার মনে মনে দেখলাম জানোয়ারটা সামনে লাফ মারতে চলেছে। তার সারা গা ধূসর, তাতে কালো কালো ফোঁটা। আকারে বড় কুকুরের সমান, ল্যাজটা মাটিতে ঝুলছে। বিড়ালের মত গুঁড়ি মেরে, রাগে শরীরের দুপাশে ল্যাজের ঝাপটা মেরে লাফ মারবে।

ঠিক সেই সময় আমি বন্দুক চালাব! মাথায় মারব কী? না, শরীরের বাঁ পাশে মারাই ভাল — তার মানে আমার দিক থেকে ডান পাশ, জন্তুটার বাঁ দিক। কিম্বা হয়ত — সেটাই আরও ভাল — একেবারে হৃৎপিণ্ডে, মাথায় মারলে গুলিটা খুলিতে ঠিকরে চলে যেতে পারে।

এমন ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছিলাম যে কোনও সময় জ্ঞান আর ছিল না।

কিছুক্ষণ পর অনুভব করলাম চোখকান খাড়া করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু জঙ্গলের দিক থেকে চোখ ফেরাতেও ভয় হচ্ছিল। হঠাৎ যদি জন্তুটা লাফ মেরে বেরিয়ে আসে তবে কী হবে?

ঘড়িটা একবার দেখে নিলাম। প্রথম গুলিটার পর দেড়ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, বুঝতে পারলাম, জঙ্গল থেকে বন্য জন্তুর বদলে লাল ফৌজের বীটাররা বেরিয়ে আসবে, এরকম আশা করা যেতে পারে। ওদের আসবার সময় হয়ে গেছে।

বেশ স্বস্তি আর আনন্দ হল। ভয় কেটে গেছে, ঘুরে তাকাতেই—ঐ ত জন্তুটা, গুঁড়ি মেরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে! জঙ্গল থেকে এখানে আসবার পথ আধখানা এর মধ্যেই প্রায় পার হয়ে গেছে। এতক্ষণ কেন যে দেখতে পাইনি তা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

আমি যা আশা করেছিলাম, এ জানোয়ারটা মোটেই তা নয়। এত প্যান্থার নয়!

লালে কমলায় মেশান রং, পিঠে কালো কালো ডোরা, গ্রীষ্ম অঞ্চলের বিরাট সাপের মত লম্বা, ঠিক যেন একটা অজগর সাপ!

স্বীকার করতেই হবে ভয়ে ত আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া আকাশ থেকে শূন্যে পড়ে যাওয়ার মত আরকি।

জন্তুটা গুঁড়ি না মেরে যেন ভেসেই আসছিল, পেটটা মাটি ছুঁয়েছে, পা একটাও দেখা যাচ্ছে না। কেবল শরীরের উপরে তোলা গোল বিরাট কাঁধটা নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। মাথাটা আকারে ষাঁড়ের মাথার মত, জানোয়ারটা অতি দ্রুত, সর্পিল গতিতে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম, তাড়াতাড়ি বন্দুকটা চেপে ধরলাম। হাতে সেই বহুপরিচিত স্পর্শ, কাঁধে বন্দুকের বাঁটের চাপ পড়তেই আমি আবার আত্মস্থ হলাম। অভ্যাসের ফল।

মাটির উপর কনুইদুটোর ভর রেখে, জন্তুটার বাঁ পাশ তাক করে গুলি করলাম। একেবারে নিখুঁৎ সই। জন্তুটা আমার দিকেই মুখ করেছিল, গুলিটা তাই গালের পিছনে কাঁধের উপর লাগল।

তর্জনীর মাঝের গাঁট দিয়ে জোরে ঘোড়া টিপলাম, শেখান নিয়মের কোনও ত্রুটি হল না। প্রথম গুলির আওয়াজ শেষ হবার আগেই যেন বন্দুক নামিয়ে চাবি টিপে নলে গুলি চালিয়ে আবার দ্বিতীয় গুলির জন্য তৈরী হলাম।

আশা করেছিলাম জন্তুটা প্রচণ্ড গর্জন করে এক ভীষণ লাফ মারবে, নয়ত কাৎ হয়ে আকাশে ঠ্যাং তুলে মরণ যন্ত্রণায় খিঁচোতে থাকবে। কিন্তু সংক্ষেপেই বলছি, যা ভেবেছিলাম সেরকম কিছুই ঘটল না। চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারলাম না: একটু কাঁপলও না। ঠিক আগের মত দ্রুত গুঁড়ি মেরে নিঃশব্দে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

বন্দুক ছোঁড়ার জন্য ভরশীলভ ব্যাজ্ আমার রয়েছে, আমাকে এমনকি ভাল স্নাইপারও বলা যেতে পারে। একশ গজ দূরের প্রায় অদৃশ্য লক্ষ্যেও আমি পাঁচটার মধ্যে পাঁচটা গুলিই লাগাতে পারি। আমার গুলি কী করে ফসকে যেতে পারে?

কিন্তু তখন আর ভাববার সময় ছিল না। আমার প্রাণ যে এখন আমার টিপ আর কর্ম-ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে তা সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করলাম। ততক্ষণে জেনেছি, সামনে যে জন্তুটা রয়েছে, সেটা বাঘ।

বাঘকে আমার সব সময়েই সিংহের চেয়ে ভয়াবহ বলে মনে হয়। বাঘের সঙ্কুচিত দৃঢ়নিবদ্ধ মাংসপেশী আর একলাফে মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ত্রিশ ফুট পার হবার ভয়াবহ ক্ষমতা রয়েছে।

দ্বিতীয় গুলিটা সোজা মাথা তাক করে মারলাম — কারণ যদি গুলিটা খুলি ছুঁয়ে চলেও যায় তবুও আরও একটা কি দুটো গুলি করার সময় পাব।

হাত স্থির ছিল। আবার মুহূর্তের মধ্যেই গুলি ভরে নিলাম।

একই ঘটনার পুনরাবর্তন চলল: জন্তুটা নিঃশব্দে আমার দিকে গুঁড়ি মেরে আসতে থাকল। মাঝখানে আর পঁচাত্তর পাও নেই — এমনকি বাঘটার খাড়া খাড়া গোঁপ দাড়িও দেখতে পাচ্ছিলাম।

একি ইন্দ্রিয়ের ছলনা? যেন এক ফালি কুয়াসায় গুলি চালাচ্ছি।

তৃতীয় গুলির সময় বাঘটা পঞ্চাশ পা দূরে — নিষ্পলক ভীষণ চোখদুটো তখন দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ একটা ভীষণ কথা মনে পড়ে গেল: আমি যে গুলি ছুঁড়ছি, সে সবকটাই ফাঁকা গুলি। নিজের ভয়াবহ অবস্থার কথা পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম: আর মাত্র দুটো গুলি বাকি, আরেকটা গুলির সারি ভরবার সময় আর নেই। আর এই শেষ গুলিদুটোও ছোট ছেলেদের বন্দুকের।

জানোয়ারটা যখন আর প্রায় পঁয়ত্রিশ পা আগে তখন চতুর্থবার গুলি করলাম।

বাঘটা একটি শব্দও করল না। কেবল তার লম্ফোদ্যত ল্যাজটা মাটিতে জোরে আছড়াতে লাগল, চড়াইপাখির দিকে চুপি চুপি এগবার সময় বিড়াল যেমন করে। এতক্ষণ পর্যন্ত ল্যাজটা তার অবিশ্বাস্য রকমের লম্বা পিঠেরই প্রসার বলে মনে হয়েছিল।

জানোয়ারটা লাফ মারার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

কোথায় কখন যে পঞ্চম গুলিটা করেছিলাম, আমার মনে নেই। ঘোড়া টিপবার সঙ্গে সঙ্গেই জানোয়ারটার বিরাট আগুনের মত শরীরটা নিঃশব্দে আশ্চর্য রকম অনায়াসে আকাশে উঠে, আমার উপরে এসে পড়ল।

অনাবশ্যক বন্দুকটা ফেলে দিয়ে, লাফ মেরে পিছনে সরে ট্রেঞ্চের তলের সেই সংকীর্ণ গর্তটায় পা ঢুকিয়ে গলে যাবার মত সময়টুকুই কেবল ছিল।

জন্তটার ভীষণ মুখটা আমার উপরে ঝুলে রইল, তার গরম, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসের স্পর্শ আমি পাচ্ছিলাম। রক্তের মত লাল জিভ, আর সাদা সাদা বিরাট বিরাট দাঁতগুলি ঠিক আমার চোখের সামনে। ভীষণ গর্জনে কানে তালা ধরে গেল।

একটা তীব্র চীৎকারের পর, যেন বাঘের ডাকের চেয়েও সেটা জোরালো, আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন আমি বিছানায়। সাদা জোব্বা পরা একজন ডাক্তার আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরটা অল্পবয়সী মিলিটারী অফিসারে ভরে গেছে, প্রত্যেকের মুখেই চাপা আশঙ্কার ছাপ।

—কেমন বোধ করছ?—ডাক্তার সাদাসিধে ভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু মনে পড়ে গেল।

—বাঘটার কী হল?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

চারিদিক থেকে উত্তর বর্ষিত হল:

—বাঘটা মরেছে!

—একেবারে তোমার ঘাড়ের উপরেই মরেছে!

—বিরাট জানোয়ার!

—চমৎকার টিপ আপনার!

—বাঘটার গায়ে পাঁচটা গুলির ফুটো।

—দুটো বাঁ গালে।

—দুটো বাঁ দিকের ফুসফুসে।

—একটা বাঁ দিকের কাঁধে।

—যদি একটু নিচে তাক করতে,—আমার পরিচিত লোকটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—তবে একেবারে হৃৎপিণ্ডে মারতে পারতে। পাঁচটা বুলেটই সোজা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে—একটাও ভিতরে ছিল না।

আমার মারা বাঘটার, বা ও অঞ্চলের ভাষায় 'জুল্বার্স'টার চামড়াটা দুমাস পর দেখতে পেলাম। আমি তখন লেনিনগ্রাদে ফিরে গেছি। আমার শিকারের সঙ্গীরা সেটা দিয়ে আমার জন্য একটা চমৎকার গালিচা বানিয়েছিল, বিরাট গালিচা, আমার ঘরের মেঝে ঢাকার পক্ষে যথেষ্ট বড়।

চামড়াটা দেখেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা এত স্পষ্টভাবে মনে পড়ল যে শিউরে উঠলাম—সেই ভীষণ শরীরটা আমার দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে, অতগুলো গুলিতেও নিশ্চুপ আর উদাসীন, এই গালিচাটার মতই।

সোনালী গাংচিল

চোদ্দই অগস্ট আমাদের মোটর লঞ্চ 'জ্ভেরোবোই' অব্দোর্স্ক ছেড়ে, উত্তর মেরুবৃত্ত পার হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই দূরের সমুদ্র তীর বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। মনে হতে লাগল পৃথিবীতে যেন জল ছাড়া আর কিছুই নেই।

সকালবেলা অবশ্য আবার মাটি দেখতে পেলাম। কিন্তু সে কী কৃপণ অনুদার চেহারা তার—না আছে আকাশ ছোঁওয়া পাহাড়, না কোনও রকমের বন। সমুদ্রের সমতলের সমানই উঁচু কয়েকটা হঠাৎ বাড়-থেমে-যাওয়া গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।

সমতল দ্বীপের মাঝখানের সাগর প্রণালী দিয়ে 'জ্ভেরোবোই' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে চলল।

দুপুরের মধ্যে আমরা পুইকোতে পৌঁছলাম, আগে এই গ্রামটা নেনেৎসদের গ্রাম ছিল।

পৃথিবীর শেষ প্রান্তে, ফাঁকা, জনহীন, খাঁ খাঁ তুন্দ্রা আর জলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া প্রান্তরে যখন হঠাৎ এই ধরণের সব লেখা দেখা যায়, তখন বড় অদ্ভুত লাগে:

'টেলিগ্রাফ'।

'খাবার ঘর'।

'ডাক্তারের সহকারীর দপ্তর'।

'সদরদপ্তর'।

একদল জেলের এখানে বসবাস। গোটা কয়েক কুঁড়েঘর, একটা গুদাম, তুন্দ্রার দিকে যাবার কাঠের পাটা ফেলা পথ, শুকোতে দেওয়া জাল—সবকিছুই ছোট ছোট অজস্র দুর্গর আগাছার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অল্প একটু জায়গার উপর দাঁড়িয়ে।

সদরে আমাদের খুব সাদর অভ্যর্থনা হল, কিন্তু খাবার ঘরটায় হঠাৎ আসা অতিথিদের জন্য খাবার দাবার কিছুই ছিল না।

এখানকার প্রধান, আস্ত্রাখানের লোক, যেমন লম্বা তেমনি রোগা। তিনি বছর আটেকের একটি ছেলেকে ডেকে আমাদের গুদামের পথটা দেখিয়ে দিতে বললেন, কিছু স্টার্জন মাছও আমাদের দিতে বললেন।

ছেলেটি আমাদের একটা মস্ত গোলাঘরের দিকে নিয়ে গেল। ভিতরে কাঠের পাটাতনের উপর গাদা করা বিরাট বিরাট স্টার্জন, একেকটা দু'গজ লম্বা, সোনালী রং আর প্রচুর তেল, অন্য স্টার্জনগুলোকে নুন মাখিয়ে ঘরের ছাত থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছেলেটি একটা মাছ বাছল, মাছটা ছোট হলেও বেশ তেল ছিল।

—এইটে নিন। এটা বেশ ভাল,—ছেলেটি বলল। মাছটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। উপহার গ্রহণ করলাম তার দড়ির প্রান্তটুকু ধরে যাতে জামাকাপড় নোংরা না হয়, হাতটাকে দূরে সরিয়ে রেখে সাবধানে আবার ফিরে এলাম। হাতটা আমার চিবুকের সমান উঁচুতে ধরা, তবুও মাছটার ল্যাজটা মাটি ঝাঁট দিয়ে চলেছে। সদর দপ্তরের ঐ দেড়শ ফুট পথ ওভাবে হাঁটা সহজ ব্যাপার নয়, ভারে হাত অসাড় হয়ে গেল।

সদরদপ্তরে আমরা বেশিক্ষণ ছিলাম না, জেলেরা সব কাজে ব্যস্ত, আমরা থাকলে ওদের কাজের ব্যাঘাত হতে পারে। তার বদলে আমরা তুন্দ্রায় শিকার করতে যাব ঠিক করলাম।

গ্রীশা নামে একটি অল্পবয়সী জেলে বলল, 'দ্বীপে গেলে কেমন হয়। আমার আজ ছুটি আছে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব কোথায় যেতে হবে। হাঁস পাওয়া যেতে পারে।'

—খুব ভাল। এক্ষুনি রওনা হলেই হয়।

—কিন্তু আপনাদের মশারী কই?—সে জিজ্ঞেস করল।

মশারী আমাদের ছিল না।

—কিচ্ছু ভাবনা নেই। মশা ত আর কামড়ে মেরে ফেলতে পারবে না।

—তারই বা ঠিক কী। আমার অভ্যাস আছে—যা বলছি শুনুন, মশারী জোগাড় করুন।

গ্রীশা তার সঙ্গীদের কাছ থেকে আমাদের দুজনের জন্য একটা মশারী জোগাড় করল। অন্যগুলো ব্যবহারে লাগছে ।

আমরা রওনা হলাম।

ভালেন্‌তীন দয়া করে মশারীটা আমাকেই প্রথম ব্যবহার করতে দিল। মশারীটা পরে নিলাম, তার উপরে টুপীটা চাপালাম, ঘোড়ার মুখের সঙ্গে বাঁধা খালি খাবারের থলের মত মনে হল।

খালের কাছে গিয়ে পেঁছিলাম। তিনটে সরু সরু নৌকো তীরে পড়েছিল।

ভালেন্‌তীন তার একটাকে আস্তে লাথি মেরে ঠেলে দিয়ে বেশ সাহসের সঙ্গে তার উপর লাফিয়ে পড়ল—তারপরেই সটান জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে বন্দুক টন্দুক সবশুদ্ধ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে মুহূর্তের জন্য আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরের মুহূর্তেই ভালেন্‌তীন জলের উপরে উঠে তীরের দিকে সাঁতার কেটে আসতে লাগল। ঘাস আর পাঁকে সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়ে তাকে ঠিক রুশ রূপকথার জলভূতের মত দেখাতে লাগল, হাসতে হাসতে আমার দমবন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

জামাকাপড় না শোকানো পর্যন্ত ভালেন্‌তীন অনবরত গালাগাল করতে থাকল।

আমরা ঘষে ঘষে তার বন্দুকটাকে শুকোলাম, পরিষ্কার করলাম, আগেরটার চেয়ে একটু বড় আরেকটা ডিঙ্গি জলে ভাসিয়ে খুব সন্তর্পণে তার উপর উঠে বসলাম। ভালেন্‌তীন আর গ্রীশা দাঁড় ধরল, আমি হাল।

সরু ডিঙ্গিটা যেমন পল্কা তেমন অস্থির, নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় হচ্ছিল। কিন্তু জলের উপর দিয়ে ডিঙ্গিটা বেশ ভালভাবেই ভেসে যেতে লাগল।

খালটা ওব্-এর একটা চওড়া অংশে গিয়ে পড়েছে। বড় বড় ঢেউ শোঁ শোঁ আওয়াজ করে নৌকোর গায়ে এসে পড়তে লাগল, আমাদের পল্কা নৌকোটিকে উল্টে দেবার ভয় দেখাতে থাকল।

মনে মনে ভাবলাম, 'একটা চুবুনিতে কিছু এসে যাবে না, কিন্তু বন্দুক নিয়ে এই গভীর জলে ডুব দেওয়া কি সম্ভব?'

—ভাল কথা, গ্রীশা, এখানটা কত গভীর হবে?

—একশ ত্রিশ ফুট। কয়েকদিন আগেই মাপ নেওয়া হয়েছে।

—হুম্! এই গভীরে ডুব দেবার এতটুকু বাসনাও নেই।

একটা সবুজ সমতল দ্বীপের দিকে আমরা দ্রুত এগচ্ছিলাম। তার বালি ঢাকা সংকীর্ণ অন্তরীপে একটা মস্তবড় পাখি বসেছিল। মুহূর্তের মধ্যেই আমি গভীরতার কথা, ডিঙ্গির ভরসাহীনতার কথা ভুলে গেলাম। বন্দুকটা তুলে নিয়ে মশারীর জালটা ঝট্‌কা মেরে ফেলে দিলাম।

নৌকোটা একদিকে কাৎ হয়ে গিয়ে আবার স্থির হয়ে গেল।

—গ্রীশা, দেখ ত, ওটা কী জান?

গ্রীশা দাঁড় বাওয়া থামাল না, কিন্তু অদ্ভুত পাখিটাকে একবার দেখে নিল।

—ঈগল-প্যাঁচা বলে মনে হচ্ছে।

—ঈগল-প্যাঁচা, যাঃ! ঈগল-প্যাঁচা দেখলে চিনতে পারতাম—ঈগল-প্যাঁচা খাড়া বসে থাকে, তাছাড়া ওদের কান থাকে। এটার বসার ধরণ ত গাংচিলের মতন।

—তবে এটা 'খালেই' হতে পারে,—জেলে অনিশ্চিতভাবে বলল।—কিন্তু ওর রংটা দেখুন।

—ঠিক, কী রং!

সাইবেরিয়ায় এক বিশেষ জাতের বড় গাংচিল পাওয়া যায়, তারই স্থানীয় নাম হল 'খালেই'। যখন বয়স কম থাকে তখন পাখিটার গায়ের রং হয় ধূসর আর সাদা, তারপরে পুরোটা সাদা হয়ে যায়। এই পাখিটার পিঙ্গল রং, পিঠের কাছটা একটু গাঢ়, মাথায় অপূর্ব সুন্দর সোনালী ছোপ।

পাখিটা আমাদের দিকে ঘুরে বসল—বুকটাও সেই একই রঙের, সোনালী রংটা আরও বেশি স্পষ্ট।

মনে মনে বড় গাংচিলের অন্য সবরকম সম্ভাব্য জাত স্মরণ করলাম, নিজে থেকেই একটার পর পর সেগুলোকে তালিকাভুক্ত করলাম। না, কোনটারই এরকম রং নয়।

তবে এটা নিশ্চয়ই অসাধারণ কিছু একটা হবে, হয়ত বৈজ্ঞানিকদের অজানা কিছু। বন্দুকের আওতায় যদি একবার আসে!

নৌকোটা একটা ঝাঁকানিতে দুলে উঠে একেবারে থেমে গেল। তিনজনেই আরেকটু হলে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম।

— ভিড়েছে!— আমি লাফিয়ে উঠলাম।

পাখিটা উড়তে সুরু করল— কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চিরকালের মত চলে যাবে। গুলি করার পক্ষে কিছু দূরেই রয়েছে— স্‌খোল্‌বের্গ, ভাই, আমায় ডুবিও না!

তাক ঠিক করে বন্দুক ছুঁড়লাম।

পাখিটা ছটফট করে আবার ঠিক হয়ে গেল।

দ্বিতীয় নলটার গুলি ছুঁড়লাম, পাখিটা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে গেল।

কৃতজ্ঞতার আবেগে আমার বিশ্বস্ত স্‌খোল্‌বের্গকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

— দেখ, দেখ! একবার দেখ।— ভালেন্‌তীন্‌ চেঁচিয়ে উঠে, জেলের পরে লাফ দিয়ে নৌকো থেকে নেমে পড়ল।

সে এক দেখবার মত দৃশ্য — যেন আমার গুলির বিস্ফোরণের ফলেই, তীরটা একেবারে আকাশে উঠে গেছে। আর দ্বীপের উপরে অজস্র, অসংখ্য কাদাখোঁচা আর হাঁস চক্কর মেরে উড়ছে।

আমার ওদিকে কোনও আগ্রহ ছিল না। বালির খাড়ি ধরে নৌকোটাকে টেনে আনার কাজটা গ্রীশা আর ভালেন্‌তীনের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি আমার অপূর্ব চমৎকার পুরস্কারের দিকে ছুটলাম।

ঐ পড়ে আছে, আশ্চর্য পাখিটি, ঢেউয়ের উপর ভাসছে। গাংচিল বটে, কিন্তু অবিশ্বাস্য তার রঙের বাহার। চোখের কাছের রক্তলাল বৃত্ত আর ঠোঁটের নিচের রুবির মত লাল ছিটে ছাড়া আর সবটাই পুরো সোনালী। এই নবাবিষ্কৃত প্রজাতির নাম রাখলাম 'লারাস্‌ অরিউস্‌'।

ওদিকে শুনছি অন্যেরা চেঁচাচ্ছে, 'হাঁস, হাঁস!'

আমার আবিষ্কারকে ছিনিয়ে নিয়ে নৌকোর দিকে ছুটলাম। পাখিটাকে একটা শুকনো

পাটার উপরে সযত্নে দাঁড় চাপা দিয়ে ঢেকে রাখলাম, যদি হঠাৎ কোনও শকুন এদিকে এসে পড়ে। তারপর সঙ্গীদের দিকে এক দৌড় মারলাম।

তুন্দ্রা হল সমতল দেশ, মশায় ভরা, হঠাৎ বাড় থেমে যাওয়া গাছ আর প্রচুর জল, কাদাখোঁচা আর হাঁসের মেঘ আর তার চেয়েও বেশি মশা, মশা আর মশা।

হাঁসের ঝাঁক নদীর ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল; অহংকারী বালি হাঁস আর কাদাখোঁচার দল আমাদের দেখেই ছড়িয়ে পড়ল। কেবল ঘাসের উপর দিয়ে ছুঁই কি না ছুঁই করে বিচিত্র রকমের পালক চারিদিকে দলেদলে ভেসে যেতে দেখলাম। কিন্তু মশার দল মেঘের আকারে বেড়েই চলল।

আমরা প্রত্যেকেই একেকটা গুঞ্জনমুখর দলের একেবারে মাঝখানে পড়ে গেলাম। মশার দল আমাদের সামনে নাচতে থাকল, মুখে কানে ঢুকে যেতে লাগল, হাত বেয়ে উঠতে লাগল। আর আমাদের গায়ে মিনিটে একহাজার এই হারে ফুটো করে চলল।

এবার ভালেন্তীনের মশারীর জাল পরবার পালা। কিন্তু এই পাৎলা জালি কাপড়টা মুখে লাগিয়েই বা কী লাভ? এই অসংখ্য ক্ষুদে রক্ত শোষকের বিরুদ্ধে নাইটদের লোহার বর্মও হয়ত কাজে লাগত না।

ভালেন্তীন জালটা খুলে ফেলে বুক পকেটে ঠেসে দিল।

খেলোয়াড় আর শিকারীদের অফুরন্ত ঔৎসুক্যের স্বভাব মশার মেঘের মধ্যে দিয়েও আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল। আমরা আলাদা আলাদা দিকে ছড়িয়ে পড়লাম, ভালেন্তীন একটুও সময় নষ্ট না করে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ সুরু করল।

কাদাখোঁচার ঝাঁক একেবারে আমার বন্দুকের সামনে দিয়ে দ্রুত চলে গেল। আমি গুলি ছুঁড়লাম না, সেগুলো একেবারে ছোট ছোট, জেলেদের ভাষায় 'ক্ষুদে মোরগ'। ইয়ামাল নেনেৎসরা বলে 'হায়ী-ভোয়ার'।

বিশ্বাসপ্রবণ পেলব কাদাখোঁচারা, যাদের এ অঞ্চলে 'ইতেদা সারমিক' বলা হয় নোংরা জলে হেঁটে বেড়াতে লাগল।

উপসাগরে গিয়ে পৌঁছলাম, একটাও গুলি করলাম না। জল এখানে যেন ফুটছে, কিন্তু এত স্বচ্ছ যে তলের দিকে সোনালী পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট জলের ফোয়ারা জলের মসৃণ বুক থেকে রূপোলী ধারায় লাফিয়ে উঠছে। প্রথমে ভেবেছিলাম গ্যাস বুঝি, তারপর দেখলাম সেগুলো হচ্ছে ঠাণ্ডা স্বচ্ছ জলের ফোয়ারা।

জলের উপরে গোছা গোছা ঘোড়া-ল্যাজ আর ঘাস গজিয়েছিল, যেন এলোমেলোভাবে ছড়ান বড় বড় টুপী।

সেই টুপীগুলোর একটাকে কেন্দ্র করে কী যেন ঘটছে দেখলাম। পা টিপে এগিয়ে গিয়ে তাক ঠিক করতেই দেখি ঘাসের উপর হলদে রঙের একটা ছোট্ট গোল চোখ। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, পুতুলের গায়ে আঁকা চোখের মত নির্বিকার আর চ্যাপ্টা।

কোন বুনো জন্তুর চোখ কী? পাখি? নাকি সাপ?

ঘাসে কোন আন্দোলন নেই। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে।

এক মিনিট কাটল। চোখটার একবারও পাতা পড়ল না।

পা টিপে টিপে এগোলাম, ওটা মিলিয়ে গেল।

আমি থামলাম। যদি পাখি হত তবে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠত। কিন্তু সেরকম হল না।

আরেক পা এগোলাম, কিন্তু কোন ফল হল না।

তারপর লক্ষ্য করলাম দ্বীপের অপর পারে ছোট ছোট হাল্কা ঢেউ: কিছু একটা ওখানে সাঁতার কেটে চলেছে, ঘাসের ওপারে।

আমি বন্দুক তুললাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা গাঢ় রঙের ছোট্ট নৌকো ঘাসের পেছন থেকে সাঁতার কেটে বেরিয়ে এল, তার পেছনে আরও ছোট ছোট নৌকোর অসংখ্য সারি।

বন্দুক নামালাম—ওগুলো ছিল 'লোহা চোখ', এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষায় 'এজে-সেউ', বিশেষ জাতের ডুবুরী হাঁস আর তার ছানাপোনা।

এখন আর ঘাসের আড়াল না থাকায় হাঁসগুলো যতদূর সম্ভব জোরে চলতে লাগল। মা-হাঁসটা মাথাটা ঠিক পেরিস্কোপের মত খাড়া উঁচিয়ে রাখল। আর তার বাচ্চাগুলো, তখনও পাখা গজায়নি, নরম পালকে ভরা গা, গলা বাড়িয়ে ক্ষুদে পাখা দিয়ে যত জোর পারে জল কেটে চলতে লাগল। এদের কি কখনো মারতে পারি?

হাঁসরা যে এখানে এত দেরীতে বাচ্চা ফোটায় তা আবিষ্কার করে অবাক হলাম—দিনটা ছিল অগস্টের পনেরো তারিখ।

মশাগুলো অসহ্য হয়ে ওঠায় তাড়াতাড়ি নদীর দিকে চলতে লাগলাম। সেখানে হাওয়ায় মশাগুলোকে উড়িয়ে নেয়, তাই বিশ্রাম করা সম্ভব।

আমার সঙ্গীরা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দম ফুরিয়ে যাওয়া ঘোড়ার মত হাঁপাচ্ছিল। তাদের দলে জুটে ধূমপান করা গেল।

মনে করলাম এখন পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের তুন্দ্রার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

—দেখুন,—গ্রীশা দ্বীপের পেছনে ছোট ছোট ঢেউ দেখিয়ে বলল।—ঐ হল সাল্মা, বালির চড়া 'দুর্ভোগের বালি'। ওখানে অনেক কিছু ধরা যায়! মণ মণ! কিন্তু দুর্ভোগও অনেক। সারাক্ষণ হাতদুটোকে ব্যস্ত রাখতে হবে, একমুহূর্ত নষ্ট করা চলবে না। আর ঐ বজ্জাত মশাগুলো রক্ত শুষে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে। এক সকাল ওখানে কাটালে পরের দুটি দিন যায় ধাক্কা সামলাতে।

'দুর্ভোগের বালি'! আমার ফোলা হাতের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম সমস্ত দ্বীপটার বেলাতেই ঐ নামটা চলতে পারে।

সন্ধ্যা নেমে আসছিল। পৃথিবীটা যেন অস্বচ্ছ কাঁচের বিরাট ডোমে ঢাকা পড়ে গেল। কাদাখোঁচাগুলো লুকিয়ে পড়েছে। সমস্ত শব্দ থেমে গেছে; কেবল অসংখ্য মশার গুনগুন ছাড়া।

হাঁসগুলো এখান ওখান থেকে একটা একটা করে দ্রুত নিঃশব্দ ছায়া ফেলে উড়ে যাচ্ছিল। গোধূলিতে তারা নিঃশব্দে পাক খেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সোঁ করে ঘাসের উপর এসে পড়ছে।

এ আমাদের সহ্যের অতীত। আবার আমরা দ্বীপের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লাম, তখনই আমাদের আসল শিকার স্বরু হল! আমি একপা ফেলতেই ছলাৎ করে উঠল। একটা হাঁস ডাকতে ডাকতে আকাশে উঠে গেল, তারপর আরেকটা, আরও একটা। পাশ থেকে, সামনে থেকে, পিছন থেকে হাঁস উঠতে থাকল।

এখানে হাঁসই কেবল রাত্তিরের খাবারের জন্য ওড়ে—ডুবুরী হাঁস নয়। শিকার শেষ হলে, আমাদের ঝোলা পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলাম সবই বালি হাঁস। এর চেয়ে 'ভাল জাতের' হাঁস এত উত্তরে আসে না।

সদরদপ্তরে ফিরতে মাঝরাত্তির হয়ে গেল, তখন অত্যন্ত কাহিল অবস্থা।

জেলেরা অবাক হয়ে বলল, 'বাবা, তোমাদের কী হাল হয়েছে।'

সত্যিই তাই, গাল, চিবুক, চোখের পাতা ফুলে স্বাভাবিকের দ্বিগুণ হয়ে গেছে, কপালভর্তি লাল চাকা চাকা দাগ।

আমার পক্ষে অবশ্য এত কষ্ট সত্যিই সফল হয়েছিল — আমি সোনালী গাংচিল পেয়েছিলাম।

জেলেদের দেখালাম পাখিটা।

— 'খালেই', — তারা বলল।

— কিন্তু রংটা দেখ! এরকম কখনও দেখেছ?

— রংটা অবশ্যই অসাধারণ। সোনালী 'খালেই'। না, দেখেছি বলতে পারি না।

খুব উৎফুল্ল হলাম।

পরদিন সকালে উঠতে দেরী হল। প্রথমেই আমার আইডেন্টিফায়ার আর পাখিটার ছাল ছাড়াবার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেলাম।

পাখিটার শরীর, ডানা, ল্যাজ, চোখের চারপাশের লাল চক্র মাপলাম। সবকিছুই 'খালেই'এর মাপের সঙ্গে মিলে গেল।

কিন্তু রংটা 'খালেই'এর বর্ণনার সঙ্গে মিলল না। তাই, তখন একমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত আমার গাংচিলটির জাত সাইবেরীয় গাংচিলের খুব কাছাকাছি, কিন্তু রঙের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। মোট কথা আমি একটা নতুন জাতের পাখি আবিষ্কার করেছি — 'লারাস্ অরিউস্'।

প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে বইটা বন্ধ করলাম।

লক্ষ্য করলাম আমার বইয়ের পাতায় আঙুল থেকে একরকম তেলতেলে হলদে দাগ লেগেছে।

'আঙুলে তেল লাগল কী করে?' — অবাক হয়ে ভাবলাম।

হাতটা শুঁকে দেখলাম আলকাতরার গন্ধ।

পাখিটাকে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। তখন আসল ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

একটা কাগজে লুকিয়ে লুকিয়ে সোনালী পাখিটাকে মুড়ে নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে ময়লার টিনে ফেলে দিলাম। ভালেন্তীন অবশ্য খুব বেশি দূরে দাঁড়িয়ে ছিল না, কিন্তু মনে হল ও কিছুই লক্ষ্য করেনি।

বিজ্ঞানকে এই নতুন অবদান কখনই দেওয়া সম্ভব হবে না — এই নতুন অতুলনীয় সুন্দর পক্ষী প্রজাতি, 'লারাস্ অরিউস্'।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম হতভাগা পাখিটা তেলের পিপেতে ডুব দিল কেমন করে?

কিন্তু জেলেদের সে কথা জিজ্ঞেস করারও ইচ্ছে হল না। কেন আবার এই অত্যাশ্চর্য সোনালী 'খালেই'এর প্রসঙ্গ টেনে আনা?

পরের দিন আমরা একটা বড় স্টীমারে চড়ে পুইকো থেকে রওনা হলাম। ভালেন্‌তীন আর আমি ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্বীপগুলির মাঝখান দিয়ে পাক খেয়ে ঢুকে যাওয়া বেরিয়ে আসা প্রণালীতে আলোর অদ্ভুত খেলার তারিফ করছিলাম। জলের মসৃণ বুক মুক্তোর মত জ্বলছিল, রত্নের মত ঝলমল করছিল আর তাতে রামধনুর নানা রং ফুটে উঠছিল।

—ও, ভাল কথা,—ভালেন্‌তীন হঠাৎ বলল।—আশা করি তোমার চমৎকার গাংচিলটার চামড়া ভরে নিতে ভোলনি নিশ্চয়ই। বিজ্ঞানের একটা নতুন অবদান তুমি ঘটাবে, তুমি নিশ্চয়ই খুব উত্তেজিত।

'মরেছি এবার!—মনে মনে বললাম।—এত এখানেই শেষ হবে না। কী উপায়ে এখন ওকে কথাটা ভোলান যায়?'

ঠিক সেই সময়েই সীলমাছের মত গোঁপ, আর জাহাজের নাবিকের মত নিবিষ্ট দৃষ্টি এক যাত্রী আমাদের সঙ্গে এসে জুটলেন।

—এখানে একটা পরীক্ষা ওরা করছে।—নানা রঙে রঙিন জলের দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

—ওরা — কারা? কী পরীক্ষা?—জিজ্ঞেস করলাম।

—পুইকোর জেলেরা। এ অঞ্চলের লোকেরা, কবে থেকে কেউ জানে না, জলের মধ্যে তেলের বস্তা ছুঁড়ে ফেলে সব মাছ একদিকে আনার প্রথা পালন করে আসছে। আলকাতরা জলের উপরে ভাসতে থাকে, আর মাছগুলো হাওয়ার অভাবে পরিষ্কার জলের দিকে যেতে বাধ্য হয়। এদেশের লোক অন্ততঃ তাই বলে। এখানকার অধিকাংশ জেলেই ক্যাস্পিয়ন সাগরের তীরবর্তী আস্ত্রাখান থেকে এসেছে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ধরা শেখানোর জন্য—এই আস্ত্রাখানীদের সন্দেহ ছিল, তাই ব্যাপারটা ওরা পরীক্ষা করে দেখবে ঠিক করে। ঐ দেখুন, ওরা ভালভাবেই কাজে লেগে গেছে বলে মনে হচ্ছে: এত তেল ঢেলেছে যে ডুব দিয়ে উঠলে চীনাদের মত দেখাবে।

—সুন্দর জল,—ভালেন্‌তীন কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল।—সোনার মত।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলল, 'তোমার পাখিটাকে এখন 'তেল পাখি' নাম দিলে ভাল হয় না?'

ওর খোঁচা না বুঝতে পারার ভাণ করে সীলগুঁপোর দিকে ফিরে উত্তর মেরুবৃত্তের উত্তরাঞ্চলের নতুন জীবন সম্বন্ধে আমার তীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে লাগলাম।

কুবান্ পাহাড়ে

বৃষ্টি আর কাদা। লেনিনগ্রাদের ঘোলাটে আকাশ ভেজা ছাদগুলোর উপর ঝুলে পড়েছে। পাতাঝরা লাইম গাছের কালো ডালে শেষ নিঃসঙ্গ পাতাটা কাঁপছে।

চিঠির বাক্সে সাদা সাদা কী যেন দেখা যাচ্ছে। খবরের কাগজ? না, একটা চিঠি, খামে পোস্টাপিসের ছাপ: 'মিকয়ান্—শাখার্'।

উত্তর ককেশিয়ার এক বন্ধুর লেখা।

'...অপ্রত্যাশিতভাবে ফেজাণ্ট মারবার অনুমতি পেয়েছি: বন্দুক প্রতি তিনটে পাখি। তোমায় আশা করছি।'

আমার পরিকল্পনার সঙ্গে বেশ মিলে গেল। আমিও ছুটিতে কোথাও গিয়ে শিকার করার কথা ভাবছিলাম।

ফেজাণ্ট অতি চমৎকার পাখি—কিন্তু তিনটে পাখি মারার আনন্দের জন্য হাজার মাইল যাওয়া ...

কিন্তু ফেজাণ্টই একমাত্র আকর্ষণ নয়। পাহাড় আর সূর্যও আছে! 'কখনও কারো পা পড়েনি সেখানে অদৃশ্য নানা জীবজন্তুর বাস...'

দুঃসাহসী কাজের জন্য যার উৎসাহ নেই, বন্য জন্তুর অপ্রত্যাশিত দর্শনে আগ্রহ নেই সে কেমন শিকারী! আর সুন্দর ফেজাণ্টগুলো ত রয়েইছে—ছোটদের কাছে বেশ গল্প করার মত। তবে তাই হোক—আমি যাব।

তিনদিনের ট্রেনযাত্রার পর গভীর নীল আকাশের তলে সূর্যের আলোয় ভরা এক দেশে এসে পৌঁছন যায়। কৃশ সমুন্নত পপ্‌লারের সারি রাস্তার দুপাশে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে, ফলের গাছের কুঁকড়োন পাতাগুলো পথচারীর মুখে পাৎলা লেসের মত ছায়া ফেলে।

স্তেপের উপরে লার্ক উড়ে বেড়ায়, পাখির বাড়ি থেকে স্টারলিং গান গায়। আজ আবার পয়লা অক্টোবর।

কুবানের উপর দিকে রেলপথ নেই — বাসে যেতে হয়।

বাসের উপরে ধুলোর হাত থেকে যাত্রীদের বাঁচাবার জন্য তাঁবু মুড়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে ছোট ছোট সেলুলয়েডের জানলা।

জানলার ফাঁক দিয়ে একটা খাড়া পাহাড় দেখা যায়, তার পায়ের কাছ দিয়ে দ্রুত বয়ে যাচ্ছে কুবান, দুধারে পাহাড় খাড়া দাঁড়িয়ে।

এইভাবেই সেই সুখের উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম। উপত্যকাটি চমৎকার আবহাওয়া আর অধিবাসীদের দীর্ঘজীবনের জন্য বিখ্যাত।

আমারও এখানে একশ বছর বাস করতে মোটেই খারাপ লাগবে না। ক্ষণস্থায়ী উষ্ণ শীত, খুব বেশি গরম নয় গ্রীষ্ম, আর বছরে অতগুলো মেঘমুক্ত দিন!

এই স্বর্গে কিছুরই অভাব নেই : রয়েছে উর্বর জমি, সরস মাঠ, তরমুজের ক্ষেত আর ফলের গাছ। চারপাশের পাহাড়ে কয়লা, রূপো মেশান সীসার গুঁড়ো, দস্তা আর তামার গুঁড়ো, আলাবাস্টার পাথর, শ্বেতপাথর পাওয়া যায়। নারজানের ঝর্ণা মাটি ফুঁড়ে ওঠে, ওক, বীচ্, বুনো ন্যাসপাতি আর অন্যান্য গাছ, চওড়া চওড়া পাতাওয়ালা ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে।

জায়গাটা শিকারে আর বুনো জন্তুতে ভর্তি; নদী আর ঝর্ণা সুন্দর নীলের উপর লাল ছিটে ট্রাউট্ মাছে ভরা।

বাস এরমধ্যেই কুড়ি মাইল পার হয়ে গেছে। আমরা ক্রাস্নোগোর্স্কায়া গ্রামে এসে পৌঁছেছি।

যাত্রীরা দুমড়োন পাগুলোকে সোজা করার জন্য আর খাবার ঘরে গিয়ে অল্প কিছু খেয়ে আসার জন্য নামল।

আমি মস্ত মস্ত পাথর দিয়ে বানান একটা বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলাম। তার ডগায় একটা বিরাট পাখি বসে ছিল, ফ্যাকাসে হলদে রঙের পালক, মাথা আর গলা সাদা — সাদা মাথা শকুন। আমি এগিয়ে আসতেই শকুনটা উঠে বিরাট ডানাগুলো মুড়ে ফেলল, লম্বা গলাটা কাঁধের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ছুঁচলো ঠোঁটওলা মাথাটা ভয়াবহভাবে আমার দিকে বেরিয়ে রইল।

আমি থামলাম। তাতে শকুনটা সন্তুষ্ট হয়ে ভারী 'লোমে' ঢাকা গলাটা বাড়িয়ে দিল, তারপর উপত্যকা আর উপত্যকাকে ঘিরে রাখা পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

শকুন, তুমি আকাশের অধিপতি, অসীম অনন্তের পাখি তুমি, এখানে তুমি কেন এসেছ? কোনও পাহাড়বাসী কোনও খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা পাথরের উপর তোমার বাসা খুঁজে পেয়ে কি সদ্যপালক ওঠা, অসহায় তোমাকে নিয়ে এসেছে? নাকি কোনও শিকারী তোমার ডানায় আঘাত করে মেঘের রাজ্য থেকে তোমাকে তার পায়ের কাছে নামিয়ে নিয়ে এসেছে?

সেই জমকালো বন্দীটি একপা থেকে আরেক পায়ে ভর দেবার সময় শৃংখল ঝংকার শোনা গেল।

কিন্তু বাসড্রাইভার তখন যাত্রীদের জড় করার জন্য হর্ণ বাজাচ্ছিল।

একটি সুদর্শন বয়স্ক কশাক আমাদের বাসে উঠতে সাহায্য করল। তার উন্নত, মহিমান্বিত মুখাবয়ব তার পিঠের বিস্ময়কর কমনীয়তার সঙ্গে খাপ খায় না। তার চলা ফেরার মধ্যে কেমন সাপের ভাব।

—কোন লাভ নেই, ওমেল্যা,—ড্রাইভার তাকে বলল।—শুধু শুধু শক্তিক্ষয় করছ—টিকিট ছাড়া তোমায় ঢুকতে দেব না।

—দেখ ভাই, কম্‌রেড্ সর্দার, টিকিটের জন্য অনেক পয়সা লাগে! বেশি দূর যাব না ...

ড্রাইভার তার মুখের উপরে দরজা ধড়াম করে বন্ধ করে দিল। কশাকটি গজগজ করতে করতে মাটি থেকে তার বোঝাটা তুলে নিয়ে ঘাড়ের উপর সজোরে রাখল।

—তবে, পায়ে হেঁটেই মেরে দেওয়া যাক।

এই বলে সে বড় বড় পা ফেলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সুরু করল।

বাসটা ঝন্‌ঝন করে, ক্যাঁচকোঁচ্ করে, ঝাঁকানি দিয়ে, সেই ধুলো পথ ধরে আস্তে আস্তে চলতে থাকল।

আবার রাস্তার ধারের চুনকাম করা পাথরগুলো ঝলসাতে লাগল।

রাস্তার কাছে চরা ঘোড়াগুলো হর্ণের জন্য অপেক্ষা না করে গাড়ির শব্দ শুনেই দৌড়ে পালাল।

একটা ছাই ছাই রঙের লম্বকর্ণ গাধা একেবারে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা কিন্তু ড্রাইভারের হাজার হর্ণেও কর্ণপাত করল না। বাসটা গাধাটার একেবারে কাছে

এসে গেল, কিন্তু গাধাটা তবুও দাঁড়িয়ে রইল, যেন একেবারে স্থাণু হয়ে গেছে, এমনকি কানটাও এতটুকু নড়ল না।

—বেফয়দা! —একজন বাচাল যাত্রী নিশ্চিতভাবে বলল। —এ হল আসল জন্তু, গর্দভ। আমি অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করেছি যেকোনও নতুন উদ্ভাবনেই গাধারা বাধা দেবে। যন্ত্রপাতি গাধা পছন্দ করে না, তাতে কাটা পড়বে সেও ভাল, কিন্তু কিছুতেই তার পথ ছেড়ে দেবে না।

ড্রাইভার গালাগাল দিতে দিতে নেমে গাধাটার কাছে গিয়ে কোনও রকম সৌজন্য না দেখিয়েই ল্যাজ পাকড়ে ধরল। যতদূর টেনে নিয়ে যাওয়া হল গাধাটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ততটা গিয়ে তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, বাসটার দিকে একবার তাকালও না।

আমরা আমাদের পথে চলে গেলাম।

সকালবেলা পরম সুখে চোখ মেললাম একটা পরিষ্কার ঘরে, যে ছোট সাদা বাড়িটায় রাত কাটিয়েছিলাম তারই ঘর। উজ্জ্বল রোদ। আবার ঘুমবার আশায় খুব জোরে চোখ বন্ধ করে রাখলাম, কিন্তু রোদ বন্ধ করা পাতা ফুঁড়ে চোখে লাগতে লাগল। তন্দ্রার ঘোরে সেই রোদ আমার স্বপ্নকে সোনার রং মাখিয়ে দিল। ঘুম ভেদ করে মোরগের চীৎকার।

কিন্তু শিকারের সময় হয়ে গেছে, সেই তিনটে ফেজাণ্ট নিয়ে আমার ভাগ্য পরীক্ষা। রুক্‌স্যাক্ বেঁধে নিলাম, দুনলা বন্দুকটা তুলে নিলাম, তারপর সেই অতিথিপরায়ণ সাদা সহরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

খুব গরম ছিল, যেতেও হবে অনেকটা পথ—ক্রাস্নোগোর্স্কায়া গ্রাম পেরিয়ে। সারাদিন হাঁটলে পর কুবানের নিচু তীরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে যেখানে ফেজাণ্ট পাওয়া যায় সেখানে পৌঁছতে পারব।

শিকারীদের কেন ফেজাণ্ট মারবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, ঘটনাক্রমে তা আবিষ্কার করলাম।

পাহাড়ের কাছে কুবানের উৎসের মুখে বাঁধ দিয়ে একটা ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হাউস করা হবে ঠিক হয়েছে। জলটা খাল কেটে কেটে শুকনো স্তাভ্রোপোল স্তেপ অঞ্চলে চালিয়ে দেওয়া হবে।

স্লুস্ বন্ধ হয়ে গেলে পর বাঁধের ওপারের জল বেড়ে উঠে ছাপিয়ে গিয়ে ক্রাস্নোগোর্স্কায়া গ্রামের কাছের উপত্যকা আর তার ঘন ঝোপঝাড় সব ভাসিয়ে দেবে। আজকের

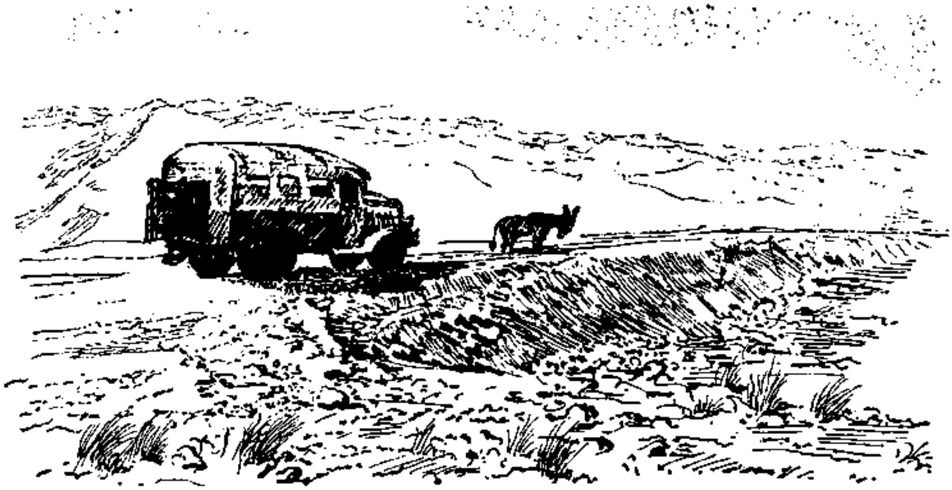

ফাঁকা অনুর্বর স্তেপ তখন উর্বর চাষোপযোগী হয়ে উঠবে, ফেজাণ্ট সব অন্যখানে চলে যাবে।

সামনেই তিনটে থাকে থাকে উঠে যাওয়া পাহাড়। বিশেষ উঁচু বলে মনে হল না — সত্যিই, প্রথম থাকটায় উঠতে আধঘণ্টার মত সময় লাগল।

একটা কর্নক্ষেত আর ঝোপঝাড়ে ভরা চওড়া ছাদের মত জায়গায় এসে পড়লাম। একটি শান্ত ধারা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। তার পারে হাঁটু গেড়ে বসে আঁজলা আঁজলা জল খাবার জন্য জলে হাত ভরে দিলাম।

হঠাৎ একেবারে আমার হাতের তলেই একটা ছোট্ট রূপোলি সাপ পিছলে বেরিয়ে এসে কিলবিল করে নদী পার হয়ে গেল।

মরুকগে যাক! এখানকার সাপ ভীষণ বিষাক্ত — হঠাৎ যদি ছুঁয়ে ফেলতাম তবেই বিপদ হত। এই সুখের দেশে একশ বছর থাকতে হলে বিশেষ সাবধানে চলতে ফিরতে হবে।

নিচে রাইফেলের আওয়াজ হল একটা, তারপর আরেকটা। একজন শিকারী, তার সামনে হলদে হলদে ছিটেওয়ালা কুকুর, ঢালু বেয়ে ছাদের দিকে উঠছিল। এক ঝাঁক নীল পাখি ভয়ের ডাক ডেকে ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে চারিদিকের পাথরে ছড়িয়ে

পড়ল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে পাখিগুলোকে স্টারলিঙের চেয়ে বড় মনে হল না — প্রায় ত্রিশটা ছিল।

ডাকটা পরিচিত। পাহাড়ী তিতির — কেক্‌লিক্‌। জানতাম এই পাখিগুলো যতক্ষণ পাহাড়ের উপরে উঠতে পারে ততক্ষণ কিছুতেই নিচের দিকে উড়ে শিকারীর কাছ থেকে দূরে চলে যাবার চেষ্টা করবে না। পাথরের গায়ের সবচেয়ে চওড়া ফাটলটা বেছে নিয়ে তার মধ্যে সেঁধিয়ে তিতিরগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, পাখিগুলো যে নিচের শিকারীর কাছ থেকে পালাবার জন্য আমার দিকেই উড়ে আসবে সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম।

অল্প পরেই নিচ থেকে আরও দুটো গুলির শব্দ হল, আর পাখিগুলোও দেখা গেল। কেক্‌লিক্‌গুলো সোজা আমার দিকেই উড়ে আসছিল, পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়বার আগেই আমি দুটোকে নামিয়ে নিলাম। আমার পুরস্কারদুটি সংগ্রহ করে বহুক্ষণ আর সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না, পাখিগুলো এত সুন্দর।

ছাই রঙের মেঠো তিতিরের চেয়ে কেক্‌লিক্‌ অনেক বড় আর তার রংও অনেক উজ্জ্বল।

কুকুর নিয়ে সেই শিকারী তখন আলস্যের কাছে এসেছে — আমি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম। লোকটি ক্রাস্নোগোর্স্কায়া গ্রামের এক হিসাবনবীশ; সে তৎক্ষণাৎ সেই তিনটে ফেজাণ্টের ব্যাপারে আমায় সাহায্য করতে রাজী হয়ে গেল। সেই রাতটা গ্রামে তার বাড়িতেই কাটালাম।

সকালবেলা হিসাবনবীশ তার প্রতিবেশীকে ডেকে নিয়ে এল — সুদর্শন, বয়স্ক কশাক, দেখা গেল সে ওমেল্যা, সেই কশাকটি যে বাসে বিনাটিকিটে উঠতে চেয়েছিল। তাকে বললাম আমরা ফেজাণ্ট মারতে যাচ্ছি, সে সানন্দে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হল।

আমরা — তার মানে দুই শিকারী — পাহাড়ের নিচে যেখানে জঙ্গল রয়েছে, সেই পথে চললাম; ওমেল্যা গেল চূড়ার দিকে। তার কাছে কোনও বন্দুক ছিল না, সে ছিল খোঁজখবর সন্ধানের জন্য।

উড়ন্ত ফেজাণ্ট গুলি করা তেমন কঠিন নয়। কঠিন হচ্ছে ঝোপ থেকে পাখিগুলোকে বের করা, লোক এলেই পাখিগুলো লুকিয়ে পড়ে আর বেরয় না।

হিসাবনবীশ তার কুকুরটাকে জঙ্গলে পাঠাতে থাকল, কিন্তু কোনও ফল হল না। প্রথমে কুকুরটা জঙ্গলে যেতে প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, শেষ পর্যন্ত যখন গেল, তখন মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কুকুরের টিকিও দেখা গেল না।

—তার মানে কোনও সন্ধান পেয়েছে,—হিসাবনবীশ স্থির করল—নইলে অনেক আগেই চলে আসত। আমি গিয়ে খোঁজ করছি।

হিসাবনবীশও জঙ্গলে অদৃশ্য হল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বন্দুকের শব্দ শোনা গেল কিছু দেরীতে। কিন্তু শব্দ হওয়া মাত্রই কুকুরটা জঙ্গল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল, পিছনে তার মনিব। দুজনেরই উস্কোখুস্কো চেহারা, কাহিল অবস্থা।

হিসাবনবীশ আসতে আসতে গালাগাল দিয়ে বলল, 'এখানে পাওয়া ভীষণ মুশকিল। কুকুরটা কিছুতেই একটা স্থির লক্ষ্যে আসতে পারে না—পাখিগুলো পালিয়ে যায়, তারপর আবার একেবারে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে বেরয়।'

হিসাবনবীশের জামা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে গা থেকে ঝরে পড়া রক্ত চাটতে লাগল।

ফেজাণ্ট কাঁটাওয়ালা ব্ল্যাকবেরি ঝোপে লুকিয়ে থাকে। ব্ল্যাকবেরি খেতে ভাল, কিন্তু পাড়া কঠিন।

ব্ল্যাকবেরি সংগ্রহের মতলব থাকলে কাটাছেঁড়া হাত, রক্ত পড়া এ সব মেনে নিতে হবে।

—আমি কুবানের তীর ধরে যাব,—হিসাবনবীশ বলল—সকালবেলা ফেজাণ্টরা জঙ্গল ছেড়ে ঘাসের দিকে খেতে যায়। এখানে দাঁড়িয়ে আপনি ওমেল্যার জন্য অপেক্ষা করুন। ওর সাহায্য ছাড়া একটা ফেজাণ্টও পাবেন না।

ওমেল্যা অবশেষে খাড়াইয়ের মাথায় আবির্ভূত হল। নিঃশব্দে আমরা চলতে লাগলাম: আমি নিচে পাহাড়ের খাড়াই আর জঙ্গলের মাঝখানে। সে চলতে লাগল খাড়াইয়ের ধার দিয়ে দিয়ে। থেকে থেকেই আমি তার দিকে তাকাই: ফেজাণ্ট মারার সময় চেঁচান নিষিদ্ধ। কোথায় শিকার লুকিয়ে আছে, আমায় কোথায় জায়গা নিতে হবে, ঠিক ছিল সে সব ওমেল্যা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবে।

একশ ফুটও পার হইনি, ওমেল্যা থেমে গেল। ট্রাফিক পুলিশের মত একটা হাত মাথার উপর তুলল, আরেকটা হাত কাঁধের সমান তুলে বাঁদিক দেখিয়ে দিল। তার মানে

পাখিটা একেবারে আমার সামনেই জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। বাঁদিকে গিয়ে হঠাৎ পাখিটার উপর পড়া হল আমার কাজ।

ব্ল্যাকবেরি ঝোপের একটা ছোট ঝোপ দৌড়ে পাক দিয়ে ওমেল্যার দিকে তাকালাম।

মাথার উপরের হাতটা না নামিয়ে, অন্য হাতটা দিয়ে সে ডানদিক দেখিয়ে দিল।

আমি ডানদিকে ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়লাম, কিন্তু দশ পা যেতেই লম্বা ল্যাজ, গোল ডানা, ছাই রঙা ফেজাণ্টটা চেঁচাতে চেঁচাতে ঝোপ ছেড়ে উড়ে পালাল। কখন হঠাৎ পাখিটা আকাশে খাড়া না উড়ে মাটির সমান্তরালে উড়তে সুরু করে, তার অপেক্ষায় রইলাম। পাখিটা যখন বাতাসে চকিতের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় ঠিক সেই মুহূর্তে ঘোড়া টেপার সময়।

বাতাসে একটা ডিগবাজী খেয়ে, ফেজাণ্টটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

ওমেল্যা হাততালি দিল।

মেয়েফেজাণ্টটাকে তুলে নিয়ে, ঝোপের ধার দিয়ে এগিয়ে চললাম।

'আর মেয়েফেজাণ্ট মারব না — কেবল পুরুষফেজাণ্ট মারব', মনে মনে ভাবলাম।

ওমেল্যা মাঝে মাঝে থেমে আমায় কোথায় যেতে হবে দেখিয়ে দিতে লাগল। আমাকে সে সোজা ফেজাণ্টের কাছে নিয়ে গেলেও আমার ভাগ্যটা খারাপ ছিল: হয় পাখিগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে উপত্যকার দিকে চলে যাচ্ছিল, নয়ত এত উপরে উঠে যাচ্ছিল যে বন্দুক ছোঁড়া মানে বৃথা গুলি নষ্ট করা।

'হিসাবনবীশও বন্দুক চালাচ্ছে না — তার মানে ফেজাণ্টগুলো ঘাসের দিকেও খেতে যায়নি।'

একথা ভাবা মাত্রই নদীর ধার থেকে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আমার দিক থেকে সে লম্বা লম্বা ঝোপে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, তাই তার গুলি করা কতটা সফল হল বুঝতে পারলাম না, কিন্তু ওমেল্যা, ওর সেই উঁচু জায়গা থেকে সবই দেখতে পাচ্ছিল। জোর হাত পা নেড়ে সে আমায় বোঝাতে লাগল যে পাখিগুলো আমার দিকেই উড়ে আসছে। তারপর সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে জানাল যে আমায় এবার লুকিয়ে পড়তে হবে।

ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ে দেখলাম জঙ্গলের উপর ফেজাণ্টরা উড়ে আসছে।

পাখিগুলো ঠিক সূর্যের তল দিয়ে উড়ছিল, সূর্যটা অবশ্য খুব উঁচুতে ছিল না, কিন্তু

এমন চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল যে কোন পাখিটা আমার দিকে উড়ে আসছে তা ঠিক করতে পারছিলাম না — কেবল ডানার চমক আর কাঁপুনি দেখতে পাচ্ছিলাম। একটার দিকে আন্দাজেই গুলি ছুঁড়লাম।

ওমেল্যার প্রশংসা ধ্বনিতে বুঝলাম লক্ষ্য বিঁধেছে।

যতক্ষণ না দেখলাম আরেকটা মেয়েফেজাণ্ট মেরেছি, ততক্ষণ খুব আনন্দে রইলাম।

তখন ঠিক করলাম ওমেল্যা যেখানে রয়েছে তার কাছে গিয়ে ওকে কেবল পুরুষ ফেজাণ্ট দেখিয়ে দিতে বলব।

খাড়া পাহাড়টা এখানেই ঢালু হয়ে নেমেছে, আমি উঠতে সুরু করলাম। হঠাৎ উপর থেকে একটা চীৎকার শোনা গেল:

— সাবধান! সাপ!

সাপটাকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি। কিন্তু দেখার পর যে ভীষণ ভয় পেলাম সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

উপর থেকে পাথরের ফাঁক দিয়ে একটা খয়েরী রঙের সাপ এঁকে বেঁকে আমার দিকে আসছিল। পুরোটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু সাপটার অসাধারণ বেড় দেখে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলাম সাপটা বেশ কয়েক হাত লম্বা হবে। শরীরটা আমার ওপর হাতের সমান মোটা।

— গুলি কর! গুলি কর! — ওমেল্যা চেঁচাল।

দৈত্যটার ল্যাজটা ঢালুর গায়ে কিলবিল করছিল, এমন সময় হঠাৎ পাথরের পিছন থেকে মাথা তুলল। আমিও গুলি করলাম।

মাথা গুঁড়ো হয়ে যাওয়া লম্বা নরম শরীরটা পিছলে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল, ল্যাজটা তখন পাথরের উপর আছড়াচ্ছে।

তখন বুঝলাম কী বোকামিই করেছি। ওমেল্যার পিলে চমকানো চীৎকারে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে আমি যে ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ আমেরিকায় নেই সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম; ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাদের দেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোথাও বিরাট অজগর পাওয়া যায় না।

একটা নিরীহ হলদে পেট জীবকে মারলাম। সাপও নয় — একটা পাহীন গিরগিটি, এতটুকুও বিষাক্ত নয়।

কী দুঃখের কথা! বাড়ি ফিরে ছোটদের কাছে যে আমার দুঃসাহসী কাজের কথা বলব, ভীষণ বিপদে পড়ে কী চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেলাম—সে সব যে গর্ব করে বলব, তা আর হল না।

হলদে গিরগিটিটা সত্যিই অস্বাভাবিক রকম বড়। হাত খাড়া করে ল্যাজের ডগাটা ধরে ওটাকে যখন তুললাম, তখনও থেঁৎলান মাথাটা মাটিতে পড়ে। তার মানে ছফুট লম্বা হবে।

ওমেল্যাকে কিছুতেই কাছে আনা গেল না: কশাক লোকটির যা কিছু গুঁড়ি মেরে হাঁটে তার সম্বন্ধেই কুসংস্কার আছে। ও নিশ্চয়ই হলদে গিরগিটি জ্যান্ত আর মরা দু অবস্থাতেই দেখেছে,—কিন্তু তবুও এর যে কোনও বিষ দাঁত নেই সে কথা নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়ার কষ্ট সহ্য করতে রাজী নয়। আমার গুলিতে গিরগিটিটার মাথাটা একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে, তাই বিষ দাঁত নেই কথাটা ওকে বোঝানো যাবে না।

আবার পাখি মারার কাজে লেগে গেলাম।

কুবান নদী যেখানে পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে পৌঁছনর পর ওমেল্যা অবশেষে একটা পুরুষফেজাণ্ট দেখতে পেল। ওর ইঙ্গিত অনুসারে কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলাম। একেবারে নদীর ধারে জঙ্গল শেষ হবার আগে পাখিটা আকাশে উঠল না।

কী অপূর্ব সুন্দর পাখি!

রঙের ঔজ্জ্বল্যে চমৎকৃত হয়ে গেলাম: মাথার কাছটা সবুজসোনালী, গলাটা বেগুনী, কমলা রঙের পিঠ আর তামাটেলাল ল্যাজ।

দক্ষিণ দেশের সূর্যের প্রতিটি রঙের ছায়ার খেলা পাখিটা দেখিয়েছে, ভাগ্যের দাক্ষিণ্যে পূর্ব ককেশিয়ার আকাশে, জলে, ফুলে, প্রজাপতিতে,—রঙের যে অপরিমিত ঐশ্বর্য দেখা যায় সেই সব। প্রকৃতি তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য পাখিটিকে উদার হস্তে দান করেছেন।

সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যে আমি সে মুহূর্তে বন্দুকের কথাও ভুলে গেলাম।

পাখিটা নদীর ধার দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে উড়ে গেল। সম্বিৎ ফিরে পেলাম, পাখিটাকে নদী পার হবার সময় গুলি করলাম। পাখিটা সূর্যের আলোয় নানা রঙের খেলা দেখিয়ে, ডিগবাজী খেয়ে ল্যাজ উপর দিক করে জলে পড়ল।

হাত আর জামাকাপড়ের কথা ভুলে গিয়ে কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে নদীর দিকে চলতে লাগলাম, কিন্তু কোনও ফল হল না। কুবানের জল মরা পাখিটাকে দখল করে, পাগলের মত নাচিয়ে, দুলিয়ে, মাঝনদীতে টেনে নিয়ে গেল। একটু নিচেই পাথরের চড়া। আমার চোখের সামনেই জলে ভেজা পাখিটা দুবার পাথরে ধাক্কা খেল, তারপর তার আগেকার জাঁকজমকের আর কিছুই বাকি রইল না।

ওমেল্যা পাখিটা উদ্ধার করার জন্য পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে জলে ডোবা সরু বাঁধটা পার হয়ে নদীর বাঁকে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু অল্প পরেই দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে কিছুই যে পায়নি তা দেখাতে দেখাতে ফিরে এল।

সেইটেই তিন নম্বরের ফেজাণ্ট, শিকার শেষ হল।

ওমেল্যা আমায় বাসে তুলে দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এল।

বাস এলে পর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ওমেল্যা একজন বিস্মিত যাত্রীর কোলে আমার রুক্‌স্যাক্‌টা দিব্যি চাপিয়ে দিয়ে দরজাটা ধড়াম করে বন্ধ করে, ড্রাইভারকে মাথা নেড়ে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিয়ে আমায় টুপী নেড়ে বিদায় জানাল।

আবার বাসটা গর্জন করল, ক্যাঁচকোঁচ করল, জোর নড়ে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে ধুলো ভরা রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু করল।

ওমেল্যা টুপীটা পরে, শার্টের তল থেকে আমার ভেজা ফেজাণ্টটা টেনে বের করে ঠ্যাং ধরে উঁচুতে তুলে আমায় চেঁচিয়ে বলল:

—আবার এস। তুমি এলে আমি সামোভারটা জ্বালাব, চলে গেলে পর এক পাত্তর চা খাব।

পাখিটার সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে, তাই ওমেল্যার ফেজাণ্ট ভোজের জন্য আমার একটুও রাগ হল না। কেবল ভাবলাম:

'যদি একশ বছর বাঁচি তবুও ফেজাণ্টের রঙের সৌন্দর্যোপভোগে কখনও ক্লান্তি আসবে না।'

ফলের গাছের পাতায় চমকানো সূর্যের আলো বেশ ফূর্তিতে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করতে লাগল।

মেঠো ইঁদুর

(হিসাবনবীশের বলা)

আমাদের হিসাবনবীশ ইভান্ ইভানভিচ্ আর আমি গত গ্রীষ্মটা পশ্চিম সাইবেরিয়ার খাকাসীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে কাটিয়েছিলাম।

আমরা উঠেছিলাম মারুশ্কা মাসির বাড়িতে। আবাকানের তীরে তাঁর কুঁড়েঘর। নদীটি খুব বড়, কাছের এক পাহাড় থেকে বেরিয়ে স্তেপের এদিক থেকে ওদিকে চলে গেছে।

আমরা সত্যি বলতে শিকার টিকার করে সময় কাটাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু শিকারের সময় সুরু হয় অগস্টে, আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ত মাত্র মে মাসের মাঝামাঝি।

— তবে কী উপায়, — ইভান্ ইভানভিচ্ বলল। — বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজতে ত আর আসিনি। চাষবাসের পক্ষে ক্ষতিকর যে জীবজন্তু আছে তাদের মারলে কেমন হয়।

— তা যদি কর, বাছা, তবে বড় ভাল হয়! — মারুশ্কা আহ্লাদে বলে উঠলেন। — মেঠো ইঁদুরের জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ। যদি কিছু না করা হয়, তবে আমাদের সমস্ত আবাদ নষ্ট হয়ে যাবে — সব খেয়ে ফেলবে, গম আর কিছুই বাদ রাখবে না। কী করে যে এদের তাড়ান যায় ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলাম, কিন্তু কোনই উপায় হল না।

— আমাদের উপর ছেড়ে দিন, — আমরা তাঁকে বললাম, — আমরা সব মেরে অঙ্কের হিসেবে শূন্যে পৌঁছে দেব, একেবারে শূন্য পয়েণ্ট, শূন্য শূন্য।

তারপর দুজনে মিলে সমস্যাটাকে কায়দা করার উপায় খুঁজে বের করতে লেগে গেলাম।

— এত অতি সহজ, — আমি বললাম, — সোজা গুলি করব। ইঁদুরগুলোর গর্তের সামনে দাঁড়াব, তারপর যেই উঁকি মারবে, দুম্ — ব্যস্, একটা কমবে। তারপর আরেকটা গর্তের সামনে যাব। আমরা দুজন আছি, দিনে একেকজন কুড়িটা করে খতম করতে পারব।

শিকারের সময় সুরু হতে এখনও দুমাস দেরী — ঠিক হিসেবে পঁচাত্তর দিন। পঁচাত্তরকে চল্লিশ দিয়ে গুণ কর, তিন হাজার হবে — হিসেবের যন্ত্রও এর চেয়ে ভাল হিসেব করতে পারবে না। তার ফলে প্রায় ছমাইল মতন জায়গা এই উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পাবে — যৌথখামারের চাষীরা আমাদের কাছে চিরদিনের মত কৃতজ্ঞ থাকবে।

এই সময়ে খাকাসীয় মহিলাটি মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে মেঝের উপর থুতু ফেললেন।

এঁর কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ তিনি এর মধ্যে একটিও কথা বলেননি।

তিনি প্রায়ই মারুশ্‌কার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ঘোড়া থেকে নামতেন — মেয়েরা সেখানে ছেলেদের মতনই ঘোড়ায় চড়ে — ভেতরে আসতেন, বেঞ্চের উপর বসে পাইপ ফুঁকতেন, একটি কথাও বলতেন না। মারুশকা তাঁকে মাখন দেওয়া চা দিতেন — তিনি সেরকম চাই খুব পছন্দ করতেন।

পুরো এক সামোভার চা খেয়ে ফেলতেন, কিন্তু তাতে তাঁর কিচ্ছু হত না, চুপ করে বসে থাকতেন, এমনকি কানের মাকড়িটাও এতটুকু নড়ত না। সেই মাকড়িগুলো ছিল দেখবার মত: প্রথমে কানের ভিতর দিয়ে একটুকরো সুতো ঢোকান, তারপর একটা তারের আংটা, তাতে ঝোলান দুল, আর এই সবকিছু থেকে ঝুলে আছে একটা রুপোর আধুলি। একটু নড়লেই আধুলিগুলোর আওয়াজ হবে, কিন্তু তারা তাদের অধিকারিণীর মতই নিঃশব্দ।

মারুশ্‌কা তাঁকে এটা ওটা নানা বিষয়ে কথা বলেন, আমাদের কথাও বলেছিলেন — আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি ইত্যাদি।

খাকাসীয় মহিলাটি পাইপে টান মারতে মারতে আমাদের দেখেই চললেন — অটল অনড়তার সমাধিপ্রস্তর। চোখদুটি কুঁচকোন, ভাবটা যেন ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে, চোখের কোণ থেকে সুন্দর ভাঁজ ছড়িয়ে পড়েছে।

মারুশ্‌কা তাঁর উচ্চ প্রশংসা করলেন: খুব অভিজ্ঞ, সৎ মহিলা, যৌথখামারের সভানেত্রী।

তাই, আগে বলেছি, খাকাসীয় মহিলাটি থুতু ফেললেন, তারপর মারুশ্‌কাকে গর গর করে দুচারটে কথা বলে বেরিয়ে গেলেন।

— কী বললেন? — আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— বিশেষ কিছু না। শুনলে তোমরা চটে যাবে।

— বলুন, বলুন।

— এক জোড়া অতি নিরেট মূর্খ: এই ধরণের একটা কিছু।

এবার অবশ্য আমার ভীষণ রেগে ওঠার পালা, কিন্তু আমি কেন ওসবের তোয়াক্কা করব? আমাদের তখন আরও প্রয়োজনীয় কাজ হাতে রয়েছে।

সেদিন অনেক ছোট ছোট গুলি তৈরী করে রাখলাম — মেঠো ইঁদুর মারতে খুব বেশি ছররা আর বারুদ প্রয়োজন হয় না। পরদিন সকালে স্তেপে চলে গেলাম। ইভান্ ইভানভিচ্ একটা গর্তের কাছে দাঁড়াল, আমি আরেকটার।

আমরা যখন কিছুটা দূরে তখনই দেখলাম গর্তের কাছে ইঁদুরগুলো স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে। কিন্তু এগিয়ে আসতেই ওগুলো শিস্ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন পৃথিবী তাদের গিলে ফেলল। কিন্তু আমরা আশা ছাড়লাম না। ক্ষিদের চোটে আবার এক্ষুনি হোক বা পরেই হোক, বেরতেই হবে।

পনেরো মিনিট চলে গেল — আধঘণ্টা — একঘণ্টা — না ইভান্ ইভানভিচ্, না আমি, কেউই একটিও গুলি ছুঁড়তে পারলাম না। অসম্ভব ব্যাপার, কারণ ধেড়ে ইঁদুরগুলো এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল, গুলি করা, কি বন্দুক তোলারও সময় পাওয়া যাচ্ছিল না।

তারপর ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে গেল। পিছন থেকে শিস্ শুনে যেই বোঁ করে পিছনে ঘুরি, গর্তে মিলিয়ে যাওয়া ইঁদুরের ল্যাজের ডগাটুকু দেখতে পাই। এইভাবে সব দিক থেকেই ইঁদুরগুলো শিস্ দেয় — আমাদের চারিদিকেই ইঁদুরের গর্ত — আর আমরা কাকতাড়ুয়ার মত পাক খাই। কিন্তু কোনই লাভ হল না -- ধাড়ী মেঠো ইঁদুরগুলো আমাদের সঙ্গে স্রেফ ইয়াকি করছিল।

অন্ততঃ তিনঘণ্টা ধরে এই ব্যাপার চলল। অবশেষে ইভান্ ইভানভিচ্ বলল, 'আমার পক্ষে এই যথেষ্ট, তোমার হিসেবের যন্ত্রটার নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। মাথা ধরে গেছে — আমার টেকো মাথার পক্ষে রোদটা বড় বেশি। বাড়ি চললাম।'

আমি বন্দুক নিয়ে পড়ে রইলাম। গর্তের দিকে নল উঁচিয়ে হাঁটুর উপর বন্দুকের ভর

রেখে মাটির উপর থেবড়ে বসলাম। ঠিক তাক মাফিক ধরে রাখতে খুব বেগ পেতে হচ্ছিল। 'এবার একবার উঁকি মারুক ব্যস ...'

দ্যুম। ধুলোর মেঘ উড়ল। দৌড়ে গর্তের কাছে গেলাম, কিন্তু — কিছুই নেই।

যতক্ষণ না গুলি ফুরল, গুলি করেই চললাম। একটাকে মারার কৃতিত্ব সত্যিই আমার হল। সূর্যাস্তের সময় নদীতীরের পথ ধরে বাড়িমুখো হলাম। মারুস্‌কার সেই খাকাসীয় মহিলা সেখানে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার দুজনেই আবাকানের তীরের কালো ছায়ায় মিশে গেছে, ঘোড়সওয়ার নিচে জলের দিকে তাকিয়ে কিম্বা তীরের দিকে।

বারান্দায় ফিরে আরেকবার পিছন ফিরে তাকালাম। মহিলা একটুখানি নড়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তখনও বকের মত জলের দিকে তাকিয়ে।

— তোমার পদ্ধতিতে কোনও কাজ হবে না, এ একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার, — পরদিন ইভান্ ইভানভিচ্ আমায় বলল। — ও বড় আদিম কায়দা। এসব ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ প্রয়োজন, ঠিক পথে এগোন চাই।

— আচ্ছা, তোমার উপরেই সব ছেড়ে দিলাম, — আমি বললাম, — আমি সেই ফাঁকে জন্তুগুলোর ছবি তুলে নেব, সেটাই ভাল।

প্রত্যেক দিন সকালে আমি মেঠো ইঁদুরের ছবি তুলতে স্তেপে চলে যেতাম। কিন্তু সে ব্যাপারেও মোটেই সুবিধে হল না, যদিও চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি, কেবল অসংখ্য ফিল্ম নষ্ট হল। এমনকি ক্যামেরার তেপায়াটা খাটিয়ে পাশে সরে গিয়ে দূর থেকে নজর রাখার চেষ্টা করলাম, তাতেও ফল হল না।

খাকাসীয় মহিলা, সেই সভানেত্রী, মারুস্‌কার ওখানে আসা বন্ধ করে দিলেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে আবাকানের তীরে দেখা যেত। তাঁর সঙ্গে এক দঙ্গল খাকাসীয় মেয়ে পুরুষ থাকত, নদীর ধারে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াত।

তারপর একদিন ওরা আসা বন্ধ করল, আমি তখন ওরা কী করত দেখতে গেলাম।

নদীর ধারটা পুরোটা খুঁড়ে ফেলেছে, কেন যে তা বলতে পারব না। সুড়ঙ্গগুলো জলের কিছু আগে শেষ হয়েছে। বোধ হয় ইচ্ছে ছিল, জলটাকে এপাশে বইয়ে দেবার,

কিন্তু কাজে নেমে যখন বুঝেছে যে ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়, তখন মাঝপথেই ছেড়ে দিয়েছে।

দিনগুলো সুন্দর ছিল, আমি রোজ ক্যামেরা নিয়ে মেঠো ইঁদুরের ছবি তুলতে যেতাম।

একদিন রাত্রে অবশ্য ঝড়ঝঞ্ঝা হল। ঠিক ঐখানেই নয়, পাহাড়ের মধ্যে কোথাও। ভীষণ বাজবিদ্যুৎ ঝড় হল, কিন্তু আমরা কেবল দূর থেকে গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনলাম, আমাদের এখানে এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল না।

সকালে বাজের গর্জনে ঘুম ভাঙল। পাহাড়ের মাথায় ঘন মেঘ, আমাদের ওখানে আকাশ চমৎকার পরিষ্কার।

আমি ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে, প্রাতরাশের অপেক্ষা না করেই স্তেপের ভিতর বেরিয়ে পড়লাম।

মেঠো ইঁদুরগুলো বাচচা দিয়েছে। সেই বাচচা ইঁদুরগুলো গর্তের ভিতর থেকে তখনই উঁকি মেরে দেখছিল। বেশ বোঝাচিছল বড়দের মত ওরা ভয় পায়নি। ওদের অন্তত দুচারটে সুন্দর ছবি তুলতে পারব আশা করছিলাম।

আবাকানের তীরে সেই ঘোড়ায় চড়া খাকাসীয় মহিলার মূর্তির কালো ছায়া আগের মতই দেখা গেল। আমায় দেখে মহিলা মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কী যেন চেঁচিয়ে বললেন, কিন্তু আমি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। তাঁর দিকে হাত নেড়েই আগের দিন যেখানে একটা চমৎকার ইঁদুরের গর্ত দেখেছিলাম সেদিকে ছুটলাম। যদি বৃষ্টির মেঘ আমাদের দিকে চলে আসে, আর আমাদের মাথায়ই ভেঙে পড়ে তবে আর মেঠো ইঁদুরের ছবি তোলা হবে না, তাই খুব তাড়াতাড়ি করছিলাম।

মা-ইঁদুরটা তার গর্তে ছোটখাট স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে ছিল। আমায় দেখেই একটা তীব্র শিস্ দিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমি গর্তের মুখ থেকে প্রায় পাঁচ ফুট দূরে ক্যামেরার তেপায়াটা বসালাম।

অবশেষে ভাগ্য প্রসন্ন হল। কয়েক মিনিট পরে একটা ছোট্ট জীব, অনেকটা নেংটি ইঁদুরের মত; ছোট্ট কালো পুঁতির মত চোখ আর কালো কান বের করল।

ক্লিক্। ইঁদুরটা শাঁ করে ঢুকে পড়ল, কিন্তু আমি তার আগেই ছবি তুলে ফেলেছি।

আবার পাঁচ মিনিট পর আরেকটা ছোট্ট ভোঁতা মুখ উঁকি মারল, তারপর আরেকটা, প্রথমটার হুবহু কপি। দুই ভাই আমায় দেখে একেবারে জমে গেল, কেবল মাথাদুটো পাখির

মত নড়তে থাকল। আমি কখন যাই সেই অপেক্ষাতেই ছিল, আমি গেলেই দুটোতে গর্ত থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে আসবে।

ক্লিক্। দুটোকেই ক্যামেরায় ধরে ফেললাম।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত শাঁই শাঁই আওয়াজ শুনতে পেলাম, সেই সঙ্গে ইঁদুরদের ভয়ার্ত শিস। ঘুরে গেলাম... ক্যামেরার তেপায়াটা প্রায় উল্টে গিয়েছিল।

স্তেপের উপর দিয়ে মসৃণ জলের ধারা সোজা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

জলটা অতি দ্রুত, নিঃশব্দে, আমার ডাইনে বাঁয়ে বইতে শুরু করল।

ব্যাপারটা কী ঘটেছে তা বোঝার চেষ্টা করলাম না। ক্যামেরাটা এক ঝটকায় তুলে নিয়ে ডাইনে বাড়িমুখো দৌড় মারলাম।

বান আমার পিছনে তেড়ে এল। এক মিনিটের মধ্যেই আমায় নকল সমুদ্রের মধ্যে হাঁটু জল ভেঙে চলতে হল। মেঠো ইঁদুরগুলো আমার চারদিকে জলের উপর লাফাতে থাকল। আমায় দেখেই ভয় পেয়ে, চেঁচিয়ে গর্তে ফিরে গেল (পরিষ্কার জলের ভিতর দিয়ে গর্তগুলো দেখা যাচ্ছিল), কিন্তু তারপরেই আবার গর্তগুলো জলে ভেসে যাওয়ায় দৌড়ে বেরিয়ে এল।

নেংটি ইঁদুরগুলো জলে ধড়ফড় করছিল। একটা কালোমত কী যেন, বোধ হয় ছুঁচো, হাঁসফাঁস করতে করতে সাঁতার কেটে কেটে বেরিয়ে গেল।

এমন একটা অত্যাশ্চর্য দৃশ্যের ছবি তুললাম না বলে পরে বড় দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তখন আমার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছিল।

জল দ্রুত বেড়ে উঠছে। সমস্ত আবাকান উপত্যকা — প্রায় মাইল দুয়েক বিস্তৃত জায়গা — প্রলয়পয়োধি জলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এই জল বাড়া কি থামবে, নাকি ডুবেই যাব জানি না।

ভাগ্য ভাল বাড়িটা বেশি দূরে ছিল না। ইভান্ ইভানভিচ্ আর মারুস্ক্যা আমার জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন। মারুস্ক্যা থেকে থেকেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন, এমনকি ক্ষোভে হাত কচলাচ্ছিলেন — আমি আর নেই ভেবে শোক করছিলেন। জল তখন কোমর অবধি উঠেছে।

বাড়িতে ঢুকেই প্রথম যে লোকটিকে দেখলাম তিনি হচ্ছেন সেই খাকাসীয় মহিলা, মুখে তাঁর অবিচ্ছেদ্য পাইপটি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনড় নিস্তব্ধভাবে বেঞ্চির উপর বসে আছেন, কুঁচকনো চোখে শান্ত দৃষ্টি।

—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জল নেমে যাবে,—ইভান্ ইভানভিচ্ ঘোষণা করল।—তখন আর মেঠো ইঁদুর—শুধু মেঠো ইঁদুর কেন কোনও রকম অনিষ্টকারী জীবই এমনকি একটি নেংটি ইঁদুরও—আবাকান উপত্যকায় থাকবে না। আমি হার স্বীকার করছি। সভানেত্রী আমাদের আচ্ছা বোকা বানিয়েছেন। এ একেবারে দিবালোকের মত পরিষ্কার,—ইভান্ ইভানভিচ্ এই বলে খাকাসীয় মহিলাটিকে দেখিয়ে দিল।

তাঁর দিকে তাকালাম।

সেই সমান অনড়, স্থাণু ভাব। পাইপ থেকে এক ধমক ধুঁয়ো কুঁকড়ে উঠছে। কুঁচকনো চোখদুটোয় কোনও ভাবাবেগ নেই।

—কিন্তু উনি কী করে জানলেন?—আমি সুরু করলাম।

—উনি জানতেন,—ইভান্ ইভানভিচ্ বাধা দিয়ে বলল।—যে পাহাড়ে বেশি বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জল কয়েক ফুট বেড়ে যাবে। এত দিবালোকের মত পরিষ্কার। তার জন্য উনি সব প্রস্তুত করে রেখেছিলেন—নালা কাটিয়ে রেখেছিলেন, যাতে বাড়তি জলটা স্তেপের উপর চলে যায়। অল্প বানে মানুষ বা গোরু ভেড়ার কোনও ক্ষতি হতে পারে না। কেবল ইঁদুরগুলোই ডুবে মরতে পারে। জলের হাত থেকে একটা গর্তও বাদ যাবে না, আমাদের হাত থেকে যেমন যাচ্ছিল। কী, হার স্বীকার করতে রাজী আছ ত, তোমার সেই মান্ধাতার আমলের পদ্ধতির জন্য লজ্জা স্বীকার করতে?

নিশ্চয়ই।

জল নেমে গেলে আমরা স্তেপে গেলাম। মেঠো ইঁদুরগুলো পা উঁচু করে চারিদিকে মরে পড়েছিল, কেবল তাদের পুঁতে দেবার কাজটাই বাকি ছিল। এইখানেই ব্যাপারটার সমাপ্তি।

রাতের বনের গোপন কথা

(একজন অল্পবয়সী প্রকৃতিবিজ্ঞানীর বলা)

টারমিজান পাখি মারার আমার ভীষণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমাদের বনে ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। পাখিগুলো খুব কাছে এগোতে দিয়ে হঠাৎ জোর ঘেউ ঘেউ ডাক ছেড়ে উপরে উঠে যাবে, তারপর ব্যাপারটা বুঝতে বুঝতেই অনেক দূরে পালিয়ে যাবে। বলা বাহুল্য ফসকে যাবে।

কিন্তু আমাদের রাখাল ছেলে কুজ্যা প্রায়ই বনে যেখানে ও ঘোড়া চরাতে যেত সেখান থেকে দুচারটে পাখি ধরে নিয়ে আসত। ওর সেই মিউজিয়মে রাখার উপযুক্ত বন্দুকটা দিয়েই ও পাখি মারত — বন্দুকটায় কেবল মর্চে আর ফুটো — কুড়ি পা দূরের জিনিসও মারা যায় না।

অবশেষে ওর কাছ থেকে গোপন তথ্যটা বের করলাম।

ছেলেটা রাত্রে পাখি মারত। এক জায়গায় একটা আগুন তৈরী করে অল্প দূরে ঝোপে লুকিয়ে থাকত। বিশ্বাস কর চাই নাই কর, টারমিজানগুলো তাদের বাচ্চাদের নিয়ে সেই আগুনের কাছে আসত। তারপর তাদের মারতে খুব একটা ভাল শিকারী হবার দরকার করে না, মাত্র দশ ফুট দূরে।

তখন হঠাৎ টারমিজান মারার সব উৎসাহ আমার উবে গেল। যাই হোক, আমি ত নিছক শিকারী নই; আমি প্রকৃতিবিজ্ঞানীও। পাখিদের চালচলন, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির খবরাখবর সংগ্রহই আমার কাজ — সোজা কথায় পক্ষীবিশারদ।

নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'টারমিজান যখন আগুন দেখে আকৃষ্ট হয়, তখন অন্য সব বুনো মুরগীই বা কেন হবে না?'

রাত্তিরে আগুন দেখে যে পোকামাকড় আকৃষ্ট হয় এত অতি জানা কথা। আমি নিজেই ত সাইকেলের আলোর সাহায্যে প্রজাপতি ধরতাম। প্রজাপতি সোজা আলোর উপর এসে পড়ে, কাঁচটা না থাকলে ঐখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ওরা ত শুধু বুদ্ধিহীন পোকামাকড়।

টারমিজানগুলো আগুনের কাছে এসে কী করতে পারে ভাবতে লাগলাম। ওরাও কি প্রজাপতির মত আগুন দেখে এত আকৃষ্ট হবে যে একেবারে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

তার চেয়ে বরং আগুনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচাটাই ওদের পক্ষে বেশি সম্ভব, অগ্নি উপাসকদের মত, কিম্বা আমাদের বাচ্চা প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা শীতের পর বনের মধ্যে প্রথম ক্যাম্পিং-এর সময় যেমন করে।

কিম্বা হয়ত পুরো টারমিজান পরিবারটাই আগুনের চারদিকে বেশ জাঁকিয়ে বসে, মা আর বাবা ওদের সেই অদ্ভুত কুকুর-কুক্কুটী ভাষায়, যা অন্য কোনও পাখি ব্যবহার করে না, বাচ্চাদের নানান কথা বোঝায়।

— কক্-কক্-কক্ — এই হল আগুন, বুঝেছ বাছারা? সাবধান — ছুঁয়ো না যেন! ভৌ-ঔ-ঔ — ভীষণ গরম!

হয়ত আগুনের শিখার সৌন্দর্যের আকর্ষণে ওরা আসে না, একটু গরম হয়ে নিতেই আসে?

রাত্তিরে আগুনের ধারে বসে যে কী অসাধারণ জিনিস শেখা যায় তা কে জানে। ঠিক আগুনের ধারে নয়, কুজ্যার মত একটু দূরে বসে।

সেইটেই ত হল আসল কথা, আগুনের ধারে বসে শিকারী নিজে কিছুই দেখতে পায় না, কিন্তু তাকে বনের সবকটি চোখ দেখতে পায়। সে তখন অন্ধের মত, তার চারদিকে অন্ধকারে যে কী ঘটছে তা সে কিছুই জানে না।

তাই ঠিক করলাম, টারমিজানরা কিসের টানে আগুনের কাছে আসে সেটা খুঁজে বের করতেই হবে। কুজ্যার সাহায্যে অবশ্য।

গোধূলির সময় রওনা হলাম। সুরু থেকেই ভাগ্য প্রসন্ন।

বড় বড় ক্র্যান্‌বেরির ঝুড়ি পিঠে নিয়ে কয়েকজন যৌথখামারের চাষী জলা পেরিয়ে আমাদের দিকে আসছিল। ওরা তখনও কিছুটা দূরে, এমন সময় হঠাৎ ওদের পায়ের কাছ থেকে একটা বুড়ো টারমিজান ঘেউ ঘেউ করে ডেকে লাফিয়ে আকাশে উঠল, তার ছানা-পোনার পুরো দলটাও তার পিছন পিছন একসঙ্গে হাঁসের মত পা ফেলে আসছিল।

কুজ্যা একটা গুলি করে দেখবে কিনা ভাবছিল, কিন্তু আমি দিলাম না।

—এখন চেপে যাও,—তাকে বললাম—ভয় পেয়ে যাবে, তারপর রাত্তিরে আর আসবে না। আগুনের কাছে ওরা কেন আসে তা জানবার আগে তোমার হাতে যে বন্দুক আছে, সে কথা একেবারে ভুলে যাও, বুঝেছ?

—খুব যে হুকুম মেরে বেড়াচ্ছ, নিজেকে কী মন কর?—কুজ্যা বেজার হয়ে বলল।

—অপেক্ষা করে দেখ না। পাখিগুলো হয়ত একেবারে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ঝলসে গিয়ে নিজে থেকেই রাত্তিরের তৈরী খাবার হয়ে থাকবে!

বুদ্ধিটা কুজ্যার পছন্দ হল। খুসি হয়ে বলল, 'তুমি যা বলেছ, তা ঠিক হতে পারে, শুধু শুধু একটা গুলি নষ্ট করা কেন?'

বাচ্চাগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে পাখিটা কোথায় উড়ে গেল সেই দিকেই নজর রাখলাম। পাখিটা একেবারে জলার ধারে উড়ে গিয়েছিল, আমরা ওদিকে কিছু শুকনো কাঠ আর ফার গাছের ডাল কুড়োতে গেলাম।

চা আর বানালাম না, রাত্তিরে শুধু স্যাণ্ডুইচ খেলাম।

অবশেষে রাত্রি নামল: অগস্টের ঠাণ্ডা বেগুনী রাত্তির, ছায়াপথ, উল্কা আর যাকিছু থাকে — সবই।

আগুন জ্বালিয়ে আমরা ঝোপের ভিতর অপেক্ষা করে রইলাম, দুজনে দুজনের থেকে পাঁচ ফুট দূরে, কুজ্যা আমার বাঁয়ে।

শুকনো কাঠের জোর আগুন, কাছের ছোট পাহাড়ের সব কিছু দেখা যাচ্ছে, এমনকি গায়ের শ্যাওলার দলাগুলো পর্যন্ত। আগুনের আলোয় গাছেদের কেমন লাগে দেখবার জন্য পিছন ফিরে তাকালাম। অনেকক্ষণ আমাদের বসে থাকতে হবে; কুজ্যা বলল একেকবার এমনও হয়েছে টারমিজানের দেখা পাবার জন্য ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে।

তারপর হঠাৎ ক্ষীণ স্বর এল:

— অরর-রক্-কক্! হো-কক্-কো!... গাউ!

ঘুরে তাকালাম: ঐ ত হাঁসের মত পা ফেলে মার্চ করে আসছে! একটা, দুটো, তিনটে ...

গোণা শেষ হয়নি এমন সময় — দ্যুম! — বাঁ দিক থেকে শোনা গেল। কুজ্যা আত্মবিস্মৃত।

একটা টারমিজান ঐখানেই পড়ল, অন্যগুলো চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

— হাঁদা! — কুজ্যার প্রতি চেঁচিয়ে উঠলাম। — দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি!

কোনও উত্তর এল না, কেবল শুকনো কাঠের খচমচ আওয়াজ ছাড়া — কুজ্যা ভেগেছে।

অন্ধকারে ওকে তাড়া করে কোনও লাভ নেই, তাই ওর মারা টারমিজানটা কুড়িয়ে নিলাম (ওকে ফিরিয়ে দেব না, ঠিক করেছিলাম — তাতে নিজেকে ওর আরও দোষী বলে মনে হবে), জ্বলন্ত কাঠিগুলো সরিয়ে দিয়ে থাবড়ে থাবড়ে আগুনটা নিবিয়ে দিলাম।

তাছাড়া আর কীই বা করব? টারমিজানরা এত বোকা নয় যে আবার আসবে।

কুজ্যা নিজের মঙ্গলের জন্য দুয়েকদিন আর আমার ধারে কাছেও এল না। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবে দেখ, নিশীথ অরণ্যের রোমাঞ্চকর গোপন কথা আমিই সর্বপ্রথম জানতে পারতাম।

টারমিজানেরা কেন আগুনের টানে আসে এ ধাঁধার তখনও কোনও উত্তর পাইনি, তাই ঠিক করলাম একদিন একা জঙ্গলে গিয়ে দেখব।

টারমিজানগুলো যাতে আগের ঘটনাটা ভুলে যায় তাই তিন দিন বাদ দিয়ে তারপর আবার সেই আগের জায়গাটায় গেলাম।

গতবার যা করেছিলাম এবারও ঠিক তাই করলাম। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম।

শরতের ঐ অন্ধকার রাত্রে একেবারে একা বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। বন্দুকে গুলি ভরে রাখলাম — ভয় পেয়েছি তা নয়, তবুও যদি দরকার হয়... ধর যদি একটা ভালুকই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে, তবে ত আর শুধু হুস্ হাস্ করে তাড়ান যাবে না।

অপেক্ষা করতে করতে ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেলাম। বসে বসে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরব বলে প্রায় ঠিক করেছি, আর বসে থেকে কোনও লাভ নেই — এমন সময় আগুনের ওপারে যেখানে গভীর অন্ধকার, সেখানে চোখ পড়ল... হলদে রঙের বড় বড় ফারের বুট ছোট ছোট পাহাড়গুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আগুনের দিকে গুঁড়ি মেরে আসছে। কিন্তু কোনও পা দেখতে পেলাম না।

একটুও ভয় পেলাম না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম, তারপর দেখলাম টারমিজানের দল। আগুনের জন্য হলদে দেখাচ্ছিল।

সামনে বাবাটা, একটা বিরাট লালভুরু টারমিজান, পথ দেখাচ্ছিল, পিছনে বাচ্চাগুলো প্রাণপণে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবার চেষ্টা করছিল।

একটা ছোট্ট টিলার মাথায় চড়ে বড় টারমিজানটা ঘাড় ফিরিয়ে পরিবারের আর সবাইকে ডেকে বলল:

—অর্র্-রক্-কক্-কক্, র্-রট্!

তখন আরেকটা অনেকটা এই ধরণের আওয়াজ হল:

—অ-র্র্-র্-সন্, অর্-র্-সন্, গাউ।

—মি-ইয়াও, মি-আও!—অন্ধকার থেকে মৃদু আওয়াজ এল। তার গিন্নীই নিশ্চয় সায় দিয়ে উঠল।

তারপর পুরো পরিবারটা, প্রায় পনেরোটা হবে, ছোট পাহাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে এল। বড় টারমিজানটা লাফিয়ে নিচে নেমে আগুনের দিকে চলতে সুরু করল, অন্যেরা পিছনে লাইন করে আসতে লাগল।

—অর্-র্-সন্, অর্-র্-সন্, রট্!—বাবাটা গুঁৎ গুঁৎ করেই চলল।

হঠাৎ মনে হল, 'এক সেকেণ্ডের মধ্যেই পাখিগুলো উড়ে যাবে!'

সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের আওয়াজ হল, টারমিজানগুলোও উড়ে পালিয়ে গেল...

কী ব্যাপার? কে মারল? নিজেই যে গুলি করেছি তা বুঝতে বেশ কিছু সময় লাগল।

কুজ্যা যখন গুলি করেছিল তখন একটা পাখি অন্ততঃ পাওয়া গিয়েছিল নিয়ে গিয়ে লোকজনকে দেখাবার মত। এবার যে তাও নেই। বন্দুকের ভিতর ছর্রার বদলে বুলেট্ ভরা ছিল, বলা বাহুল্য, গুলিটা লাগাতেও পারিনি। পক্ষীতত্ত্ববিশারদ আমি। পক্ষীতত্ত্ববিশারদ না বলে ক্যাবলামতত্ত্ববিশারদ বলাই ঠিক হবে...

কাজেই রাত্তির বেলা আগুনের ধারে টারমিজানরা কী করে তা আর তোমাদের বলতে পারলাম না, যদিও এখনও আমার জানার খুব ইচ্ছে।

তোমাদের মধ্যে কারো কারো হয়ত পুরোটা দেখবার মত ধৈর্য আর সংযম থাকতে পারে, কী বল, তাই না?

খরগোসের ল্যাজে নুন দেওয়া

(জাহাজের কারিগরের বলা)

ছোটবেলা থেকে আমার সব চেয়ে বড় ইচ্ছে ছিল এমন দেশে যাব যেখানে কোন জীবজন্তু পাখি আমায় দেখে ভয় পাবে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ধর একটা খরগোস দৌড়ে যাচ্ছে। 'এই, খরগোস, খরগোস!' বলে চেঁচিয়ে ডাকতেই ওটা থেমে গেল। আমি ওর পিঠ আর মাথা চাপড়ে বললাম: 'ঠিক আছে, দৌড় লাগাও!'

যদি কোন নেকড়ে আসত আমি চেঁচাতাম, 'পালা শীগ্‌গীর, ব্যাটা পাজি!' আর ওমনি ওটা যত জোর পারে দৌড়ে পালাত। যদি পাখি হত তবে কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতাম।

কিন্তু এখন একটা সিস্‌কিনও আমায় তার কুড়ি হাতের মধ্যে ঘেঁষতে দেবে না — গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে তাকে দেখতে হবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, পাশের বাড়ির সিঁড়িতে শুয়ে থাকা বেড়ালটাও তোমায় এতটুকু ছুঁতে দেবে না, তোমায় দেখেই ধনুকের মত পিঠ বেঁকিয়ে, ল্যাজটা উঁচুতে তুলে এক — দুই — তিন — বলতে না বলতেই চিলেকোঠায় উঠে যাবে। বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটবার সময় মনে হয় যেন সব কিছু একেবারে ফাঁকা — সবরকম প্রাণী লুকিয়ে পড়েছে, চুপ করে গেছে। একবার একটা কাঠবিড়ালী দেখেছিলাম, ল্যাজ দেখেছিলাম বললেই ঠিক হয়। কিন্তু হয়ত সেটা মোটেই কাঠবিড়ালী ছিল না।

আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন বাড়ির বড়দের এমন কোনও দেশ আছে কিনা যেখানে বুনো জন্তুরা মানুষদের কাছে আসতে দেয়, সে কথা জিজ্ঞেস করেছি। বড়রা শুনে কেবল হাসাহাসি করত, 'খরগোসের ল্যাজে কিছুটা নুন দিয়ে দাও, দেখবে ওরা কাছে আসতে দেবে' এধরণের যত বাজে কথা বলত।

খুব অপমান হয়েছিল, বড় হবার পরেও তা ভুলতে পারিনি। অবশ্য খরগোসকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাছে আনবার আশা আমার আর নেই। আমি ছিলাম খালাসী, জাহাজের মিস্ত্রী, তিমি মাছ ধরার দিনেমারী জাহাজে চড়ে অনেক বিদেশ ঘুরেছি।

তিমি স্বভাবতই আমাদের কাছ থেকে খুব দ্রুত সাঁতার কেটে পালাত, তার কারণও আছে। আমরা তিমি দেখলে কামান ছুঁড়তাম, গোলার সঙ্গে হারপুন লাগান থাকত, হারপুনটা আবার দড়ি দিয়ে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা।

এই শিকার দেখে আমার একটুও আনন্দ হত না। দেখবার কীই বা ছিল? উপরে আকাশ, নিচে জল, তার বুকে বরফ ভেসে বেড়াচ্ছে: আমরা সব সময়েই শীতের দেশের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

একবার ঝড়ে আমরা বিপথে চলে গিয়েছিলাম। আমি নিচে, যন্ত্রের কাছে ছিলাম, কত অক্ষাংশে চলেছি সে বিষয়ে আমার কোনও ঔৎসুক্য ছিল না।

হঠাৎ একটা চীৎকার শুনলাম: 'মাটি! ঘাস, সবুজ ঘাস!'

এ অবিশ্বাস্য, তাই দৌড়ে ডেকের উপর এলাম।

সত্যিই, সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটি, আকাশে উজ্জ্বল সূর্য। সবকিছু ঝলমল করছে, এমনকি গানও গাইছে যেন।

ক্যাপ্টেন জাহাজ থামালেন, আমরা সবাই ঐ সবুজ দ্বীপে বেড়াবার অনুমতি চাইলাম।

নৌকো করে সবাই তীরে গিয়ে পৌঁছিয়ে তারপর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। আমি অনেক দূরে চলে গেলাম, সেই দূরের পাহাড়টা ছাড়িয়ে। শেষে ক্লান্ত হয়ে একটা মাঠের মাঝখানে শুয়ে পড়লাম।

চারপাশে তাকালাম—ওটা কী? সাদামত একটা কী যেন। উঠে বসলাম। একটা খরগোস, আসল খরগোস, সাদা ধপ্‌ধপে।

'কী আশ্চর্য! ঘাসগুলো সবুজ, তবুও খরগোসটা সাদা। দেশে ত গ্রীষ্মকালে খরগোস ধূসর হয়ে যায়।'

নড়তেও ভয় করছিল, যদি খরগোসটা ভয় পেয়ে পালায়।

ঐ, আরেকটা, আরে, আরও একটা—পুরো এক ডজন!

চুপ করে বসে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে একটু নড়াচড়া সুরু করলাম। খরগোসগুলো আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে এক লাফ মারল। পালাল, তাই ভাবছ ত? না, আমার দিকেই লাফিয়ে এল।

দেখতে দেখতে অন্ততঃ একশটা খরগোস আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কোন জাতের জীব বসে আছে সেটা খুঁজে বের করতে তারা উৎসুক।

আমি আমার ইচ্ছামত নড়াচড়া করতে লাগলাম—এমনকি সিগারেট পর্যন্ত ধরালাম। খরগোসগুলো আমায় ভাল করে দেখার জন্য পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বসল।

তাতে আমার খুব মজা লাগল, কথা বলতে সুরু করলাম।

—হুঁ, যত সব দুষ্টুর দল! নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি! ভয় পায় না এমন খরগোস কি জগতে আছে? দাঁড়াও, এবার তোমাদের এমন ভয় দেখাব!

কিন্তু খরগোসগুলো কান নেড়ে নেড়ে দেখেই চলল।

—সাবধান, আমি কিন্তু গুলি করতে যাচ্ছি!

আমার কাছে কোনও বন্দুক ছিল না, তাই ভাণ করতে হল। হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম: 'দুম্‌-দুম্‌!'

খরগোসগুলো লাফিয়ে উঠল—হয়তো অবাক হয়ে ভাবল, এ আবার কী অদ্ভুত চীজ্‌। কিন্তু একটাও পালাল না। কাছের ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল।

এখন যদি সঙ্গে নুন থাকত, তবে প্রত্যেকটা খরগোসের ল্যাজে দিয়ে দিতে পারতাম...

তারপর মনে হল, বোধ হয় জাহাজে ফেরার সময় হয়ে গেছে।

—আচ্ছা, সাহসী খরগোসের দল, আজ তবে আসি!

এই বলে রওনা হলাম, তখন আমার একমাত্র ভয় একটাকেও পাছে মাড়িয়ে দিই।

কিন্তু কোন দিকে যাব? জাহাজটা কোথায় আমার ত সে বিষয়ে এতটুকু ধারণাও নেই।

সামনেই কয়েকটা টিলা ছিল। ঠিক করলাম তার একটার মাথায় চড়ে সমুদ্রটা কোথায় দেখে নিয়ে, তারপর সোজা নাকবরাবর ঐ দিকেই চলব। একবার সমুদ্রে পৌঁছতে পারলে, সহজেই জাহাজ খুঁজে নিতে পারব।

পাহাড়ে চড়তে সুরু করলাম, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলাম। মাটিতে এগুলো কি সত্যিই গোরুর পায়ের দাগ? অজস্র রয়েছে—নিশ্চয়ই একটা গোরুর পাল এদিক দিয়ে গেছে।

মনে মনে ভাবলাম: 'ঠিক! গোরুর পাল যখন আছে, তখন গোপালও নিশ্চয়ই আছে, তার মানে এজায়গায় মানুষের বসতিও আছে, এখানকার খরগোসদের এত সাহস হল কী করে সে কথা রাখাল ছেলেটিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

গোরুর চলার দাগ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে এল। তারপর বেশ একটা ভালরকম পথই প্রায় পেয়ে গেলাম, গোরুগুলো নিশ্চয়ই এ পথে একটার পর একটা সার বেঁধে গেছে। পথটা এমন একটা খাড়া ঢালুতে গিয়ে পড়ল যে আমায় সেখানে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলতে হল। অবাক লাগল, আমার পক্ষেই ওঠা কঠিন, গোরুগুলো কী ভাবে উঠল? অদ্ভুত গোরু ত—এইভাবে বেয়ে ওঠা বরং ছাগলের কাজ।

পাহাড়ের মাথায় পেঁছিলাম : পিছনে তাকাবার আর সাহস হল না , এত উঁচু জায়গাটা। একেবারে সামনেই একটা মস্ত পাথর — এটা পার হই কী করে ?

দুহাত দিয়ে পাথরটাকে ধরে , পা দিয়ে জোর দিয়ে একেবারে পেটে ভর দিয়ে উপরে এসে পড়লাম। এর পরে একটু বিশ্রাম প্রয়োজন।

আর বিশ্রাম। দশ ফুট দূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা মস্ত , শিংওলা , কদাকার জন্তু , লোমগুলো মাটির কাছে ঝুলে পড়েছে , তার খুরগুলো ধারালো। জানোয়ারটা সোজা আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

অল্প কিছুক্ষণ আমায় দেখে নিয়েই , ওটা সোজা তেড়ে এল।

প্রথমেই পালাবার প্রবল বাসনা হয়েছিল , কিন্তু কোথায় পালাব ? এই খাড়া পাহাড়ের নিচে লাফ মারলে , নুড়ি পাথরের মত গড়িয়ে পড়ে একবারে চুরমার হয়ে যাব। নিচে এক পলক তাকানই মাথা ঘোরার পক্ষে যথেষ্ট।

সামনে আবার সেই জন্তুটা আমায় গুঁতিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করে দেবার জন্য শিং উঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। চোখ বন্ধ করে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলাম।

জানোয়ারটা আমার এত কাছে এসে গেল যে তার গরম নিঃশ্বাস গায়ে লাগতে লাগল।

আর পারলাম না , একটা চোখ খুলে ফেললাম। দেখি — দুজনের প্রায় নাকে নাক ঠেকে যাওয়া অবস্থা ! জানোয়ারটা নাক ফুলিয়ে নিঃশ্বাস টেনে একপাশে ঘোঁৎ করে দম ছেড়ে ঘুরে গিয়ে ... আস্তে আস্তে ফিরে গেল।

আমি স্বস্তিতে অনেকটা নিঃশ্বাস নিলাম : তার মানে আমায় মারার ইচ্ছে জন্তুটার ছিল না ! বোধ হয় সুবুদ্ধি হয়েছে , তাই কি ?

উঠে দাঁড়ালাম , দেখতে পেলাম এক পাল ঐ জন্তু , অন্ততঃ কুড়িটা , পাহাড়ে চরে বেড়াচ্ছে। ওর যে কোনও একটা অনায়াসে আমায় ঢুঁসিয়ে মাড়িয়ে শেষ করে দিতে পারে , কিন্তু কারুরই সেরকম কোনও ইচ্ছে দেখা গেল না।

তখন মনে পড়ল যে এই জন্তুর ছবি ত আমি দেখেছি। এমনকি নামটাও মনে পড়ল : কস্তুরীমহিষ।

চারিদিকে তাকালাম। ঐ ত , মহিষগুলোর পিছনে দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

ভাবলাম: 'এতক্ষণ পর্যন্ত তো এদের বেশ শান্তিপ্রিয় ভাব দেখা গেল। পাহাড়ের ধার দিয়ে একটা কোনও পায়ে চলা পথ ধরে নিচে চলে গেলেই হয়।'

কিন্তু সেরকম কোনও পথই পাওয়া গেল না। এমন সময় জাহাজের সাইরেন শুনতে পেলাম, তার মানে আমি নেই বুঝতে পেরে ওরা ডাকছে। কেউ জানে না আমি কোথায়, আমি একেবারে একা। আমি হারিয়ে গেছি!

এখন কাজ হল সোজা ঐ মহিষের দলের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া। আর কোনও উপায় নেই—ওদের ভয় দেখিয়ে পেরিয়ে যাব।

ভয়ে তখন কাঠ হয়ে গেছি, কিন্তু তবুও গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত চীৎকার বের করলাম, তার আওয়াজে নিজেই চমকে উঠলাম, আমার সাধারণ গলার চেয়ে তা এত অন্যরকম; তারপর মাটিতে পা ঠুকে হাতদুটো একেবারে কাঁধ থেকে উইন্‌ড্‌মিলের মত বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলাম।

মহিষগুলো সবকটা আমার দিকে তাকিয়ে তাদের মহিষীদের ঘিরে দাঁড়াল, শিংগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

তা দেখে আমার উৎসাহ নিবে গেল, মাটির উপর ধপ্ করে বসে পড়লাম।

মহিষগুলো কিছুক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর যখন দেখল আমি ওদের কোনও ক্ষতি করতে চাই না, তখন আবার ঘাস খেতে সুরু করল।

জাহাজটা সাইরেনের পর সাইরেন দিয়েই চলেছে।

আমার কেঁদে ফেলার অবস্থা। টুপীটা হাতে নিয়ে মহিষদের অনেক কাকুতিমিনতি করলাম। (তার জন্য আমার লজ্জার কিছু নেই, সেখানে দেখবার ত কেউ ছিল না)।

— সত্যি বলছি, — তাদের বললাম, — আমি কেবল জাহাজে ফিরে যেতে চাই, আমি আপনাদের গাত্র স্পর্শও করব না। আপনারা অনুগ্রহ করে আমায় ঢুঁসবেন না, দোহাই আপনাদের, কামড়ে টামড়ে দেবেন না!... আমি এই কোনও রকমে পাশ কাটিয়ে চলে যাব, দিব্যি করে বলছি!

মহিষগুলো রোমন্থন করতে করতে আমার দিকে ফিরে চাইল।

আমি উঠে সোজা মহিষের পালের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আর সারাক্ষণ জপে চললাম:

— প্রিয়তমগণ, সত্যিই বলিতেছি, আমার উদ্দেশ্য অতি সৎ... আমি কেবল আমার জাহাজের অভিমুখেই চলিতেছি।

পার হয়ে যেতে যেতে আস্তে আস্তে ওদের এক জনের পিঠ চাপড়েও দিলাম।

একটা জায়গায় আবার দুটোর মাঝখান দিয়ে সেঁধিয়ে যেতে হয়েছে। ততক্ষণে আমার সাহস বেড়ে গেছে।

ওদের বললাম, 'দেখ হে, যেতে দাও! পথ আটকে দাঁড়াবার মানে কী?'

আরও এগিয়ে একটা মহিষ একেবারে পথ জুড়ে শুয়ে ছিল।

— এই, ওহে, ওঠ, ওঠ!

মহিষটা যেমন শুয়ে ছিল, তেমনিই রইল, একটুও সরল না।

— ওঠ্, কানে শুনতে পাস না!

কাছে গিয়ে পেটের তলে পা ঢুকিয়ে দিলাম। বাব্বাঃ কী পুরু লোম! পাটা যেন খড়ের গাদায় ঢুকে গেল।

মহিষটা তাতে কিছু মনে করল না। কেবল একবার ডেকে, অলসভাবে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে একটু উঠল, ঠিক যেন পোষা গোরু, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে নেহাৎ অনিচ্ছায় একদিকে চলে গেল। আমি এমনকি তাড়াতাড়ির জন্য ওটাকে একটু ঠেলেও দিলাম।

মহিষের পালের ভিতর দিয়ে পার হয়ে পাহাড়ের নিচে এসে, উপত্যকার উপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে দৌড় মারলাম। জাহাজের সাইরেনে তখন বিপদ সংকেত ধ্বনিত হচ্ছে।

যত জোর পারি দৌড়তে লাগলাম, মহিষগুলো কী কদাকার দৌড়তে দৌড়তে সেকথাই ভাবলাম। ভেড়ার মত ওদেরও লোম কেটে নিলে ছাগলের চেয়ে বেশি বড় হবে না। অমন খাড়া পাহাড়ে ওদের ঐ ধারালো ক্ষুর নিয়ে উঠতে পারার তাই অবাক হবার কিছু নেই।

হঠাৎ থেমে গেলাম: ওদুটো কী — কুকুর?

কুকুর! ওগুলো নেকড়ে বাঘ! একেবারে খাঁটি উত্তুরে নেকড়ে — দেখেই চিনতে পারলাম। জাহাজ থেকে অনেকবার নেকড়ে বাঘ দেখেছি।

নেকড়েদুটো সোজা আমার দিকেই আসছিল, নাক মাটির দিকে নামান। তখনও আমার টের পায়নি। হাওয়াটা আমার দিকেই বইছিল, তাই মানুষের গন্ধ তারা পায়নি। নেকড়ে-দুটো মাটির দিকে চোখ করে দৌড়েই চলল।

আমি সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাতে আমায় দেখতে না পেয়ে সোজা দৌড়ে চলে যায়।

এমনই দুর্ভাগ্য, নেকড়েগুলো যখন একেবারে কাছে এসে গেছে, ঠিক তখনই একটা হতভাগা পাজী মশা আমার নাকের উপর এসে বসল। এদিকে ভয়ে নড়তে পারছি না: কাছেই যখন সাংঘাতিক নেকড়ে বাঘ হাঁক করে গিলে ফেলতে পারে, তখন একটা তুচ্ছ মশায় কী এসে যায়। হতভাগাটা ইচ্ছেমত আমার মুখের উপরে নিচে, সামনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল, শেষকালে ঠিক নাকের ভিতরে ঘুরতে লাগল।

সে যা কাণ্ড!

নাকের ভিতরে ঢুকে মশাটা সুড় সুড় সুড় সুড় করতে লাগল, শেষ পর্যন্ত আর চেপে থাকতে পারলাম না — হ্যাঁ-চো — ভীষণ জোর হেঁচে ফেললাম।

নেকড়েদুটো থেমে গেল, আমার দিকে তাকাল... তারপর প্রাণ ভয়ে দেছুট, দেছুট।

আমিও দৌড়তে সুরু করলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই তীরে পৌঁছে গেলাম। তীরের কাছে আমার জন্য একটা নৌকো রাখা ছিল, জাহাজটা তার সাইরেনের শব্দে আমাকে ধমক দিল।

আমরা যে দেশে নেমেছিলাম তার নামটা জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম।

— গ্রীণল্যাণ্ডের পূর্ব তীর, — উত্তর এল।

— তা হতে পারে, — আমি মেনে নিয়ে বললাম — কিন্তু এ কী ধরণের দেশ? এখানে সবকিছুই উল্টো : এদেশের খরগোসগুলো নিজে থেকেই লাফিয়ে প্রায় পকেটে ঢুকে যায়, বুনো মহিষগুলো এত শান্ত যে তাদের মারধোর করলেও কোনও বিপদের ভয় নেই, নেকড়ে-গুলো লোকের হাঁচি শুনেই দৌড় মেরে পালায়, ভাবটা যেন কেউ কামান দেগেছে।

আর মনে মনে ভাবলাম : 'ছোটবেলায় যেমন কল্পনা করতাম ঠিক তেমনি, সেই যে খরগোসের ল্যাজে নুন দিতে চাইতাম।'

ক্যাপ্টেন হেসে বললেন।

— তার কারণ, এদেশে কেউ থাকে না। খরগোস আর বুনো মহিষের মানুষের সঙ্গে পরিচয় নেই, তাই তাকে ভয়ও পায় না।

— নেকড়ে কেন তবে ভয় পায়? — আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— নেকড়ে বাঘ এই হালে আমেরিকা থেকে পার হয়ে এদেশে চলে এসেছে, মানুষ কী ধরণের প্রাণী আর তার বন্দুকটা কোন জাতের যন্ত্র তা খুব ভাল করেই তারা জানে। তাই মানুষের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চায় না।

ক্যাপ্টেন আমায় এই কথাই বলেছিলেন, মনে হয় ঠিকই বলেছেন।

ভাববার কথা

ফিকে গোলাপী আর জলপাই সবুজ

বেড়িয়ে ফিরে পকেট থেকে তুলোভর্তি বাক্সটা বের করে সযত্নে খুললাম।

তুলোর ভিতরে ছিল একটা ছোট্ট ডিম। অত্যন্ত পলকা, পাছে আমার শক্ত আঙুলে লেগে ভেঙে যায়, তাই বাক্স থেকে একেবারে হাতের তালুতে ডিমটাকে গড়িয়ে দিলাম।

চমৎকার ডিমটা। লম্বাটে নিখুঁৎ গড়ন, ঠিক যেন মুক্তো। দীপ্ত, সজীব মুক্তো, জলপাই বা কচি উইলো পাতার মত রং, কোথাও এতটুকু খুঁৎ নেই।

ডিমের ভিতরে একটি রহস্যময় অজানা প্রাণ রয়েছে, সে তখনও বাইরে বেরবার জন্য প্রস্তুত নয়। পাৎলা, ঠুনকো খোলের ভিতর দিয়ে একটা ম্লান গোলাপী আভা দেখা যাচ্ছিল।

কোন রং দিয়ে পট বা কাগজের বুকে এই প্রাণের মাধুর্যকে আনা যায়, এই ফিকে গোলাপী আর জলপাই সবুজ রঙদুটির মিশল? রঙের বাটিতে এদুটি রং মেশালেই এক কদাকার নোংরা ব্যাপার হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে এই দুটি রং এক হয়ে গিয়েও কেমন আলাদা হয়ে রয়েছে: এই গোলাপী রং বদলে গিয়ে ডানাওয়ালা পাখি হয়ে গান গাইবে, জলপাই সবুজ তখন শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

ডিমটা নাইটিংগেলের।

নাইটিংগেলের আরও ডিম আমি সংগ্রহ করেছি, কিন্তু তার সবকটাই চকোলেট রঙের। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই দিনই লতানে অল্‌ডার গাছ আর ঘন উইলো ঝোপের নিচে একটা বাসায় এই জলপাই সবুজ ডিমটি পেয়েছি।

পাঁচটা ডিম ছিল। কেবল একটাই নিয়েছি, তা নইলে এদের মা বাসা ছেড়ে চলে যাবে, অন্য ডিমগুলোর তাহলে আর বাচ্চা ফুটবে না। আমার কাজের জন্য একটা ডিমই যথেষ্ট। শরৎকালে সহরে আমার সংগ্রহ নিয়ে যাব। সহরের লোকরা পাখির কথা ত মোটেই ভাবে না—এই সুন্দর ডিমটা দেখে তাদের চক্ষুসার্থক হবে।

গোলাপীশ্যামল ডিমটাকে হাতের উপর আস্তে আস্তে দোলাতে দোলাতে এই সবই ভাবছিলাম।

অন্য হাতটা দিয়ে টেবিলের উপর থেকে কয়েকটা একদিক ছুঁচলো পাৎলা কাঁচের নল নিলাম। তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালটা বেছে নিয়ে একটা প্লেট আর একটা পিন নিলাম। ডিমটাকে ফুটো করে প্লেটের উপর ভিতরের জিনিসগুলো ঢালব।

কিন্তু তখন ত গোলাপী রংটা আর থাকবে না, একটা নাইটিংগেলও পৃথিবীর বুক থেকে কমে যাবে!

একথা সত্যি, আমাদের গ্রামের চারিদিকে আরও অনেক নাইটিংগেল আছে। দিনগুলো যখন বড় হয়ে যায়, রাতগুলো হয় বেশ গরম আর হালকা, বাতাস উইলোর তুলোয় ভরে যায়, তখন ওদের গান সুরু হয়, দিনের কোনও সময়েই তা থামে না।

কাল বিকেলে, জানলা দিয়ে নাইটিংগেলের গান এল। আমাদের পড়শীর ছেলে স্মিরকা, তার বয়স আট, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল: 'ওরা ঘুময় কখন?'

সন্ধ্যাবেলা বড় একা একা লাগছিল, কিছুই ভাল লাগছিল না। সিগারেট খেতে খেতে নানান কথা ভাবব, মনে মনে জীবনটার একটা হিসেবনিকেশ করব বলে বাড়ির বারান্দায় গিয়েছি। তখনও নাইটিংগেলরা গান গেয়েই চলেছে।

স্মিরকাও এসে আমার পাশে বসল। বেশ বোঝা গেল সেও ঘুমতে পারেনি, ওরও মনটা কেমন উদাস হয়ে গেছে।

থাকুক বসে, জ্বালাতন না করলেই হল।

বসে বসে দুজনে আপন মনে নিজের নিজের ভাবনা ভাবতে লাগলাম, ওদিকে নাইটিংগেল তার আপন গান গেয়েই চলল।

হঠাৎ একটা ল্যাণ্ডরেল-এর তীব্র চীৎকার কানে এসে বাজল: কর্কশ 'গ্র্যাজ, গ্র্যাজ! গ্র্যাজ, গ্র্যাজ!' শব্দ মাঠের কুয়াসা ভেদ করে আসতে লাগল।

তারপরেই ঝোপ থেকে নাইটিংগেলের নরম মিষ্টি স্বর স্রোতের মত বয়ে এল: 'জাগ্-জাগ্-জাগ্!'

—গ্র্যাজ, গ্র্যাজ! —ল্যাণ্ডরেলটা হেঁকে উঠল।

এইভাবেই তাদের অক্লান্ত তর্ক চলতে লাগল। আমরা বসে বসে সব শুনে চললাম প্রথমে মনে হয়েছিল, সব নাইটিংগেল একভাবেই গান গায়, ল্যাণ্ডরেলের কর্কশ চীৎকার

হল সে গানের বেসুরো পর্দা। কিন্তু শুনতে শুনতে বুঝতে পারলাম ল্যাওরেলের ডাকের সঙ্গে নাইটিংগেলের ডাকের কোনও বিরোধ নেই। দুজনের ডাকই গানের সুরে সুর মিলিয়েছে, কিন্তু তবুও একাকার হয়ে যায়নি — ডিমটার সেই গোলাপী আর জলপাই সবুজ রঙের মতন।

নাইটিংগেলদের নিজেদের গানের মধ্যে পার্থক্য আছে। একটা পাখি খুব কাছেই কোথাও ডাকছিল — রাস্তার ওপারে জঙ্গলে ঢাকা স্যাঁতসেঁতে মাঠটার কোথাও। স্বরটা খুব চড়া, কিন্তু জোরাল নয়, একেকটা পর্দা বেশ কর্কশ শোনাচ্ছিল, একেক সময় গাইয়ে সুর ধরে রাখতেও পারছিল না: নিশ্চয়ই খুব বাচচা হবে।

দ্বিতীয় পাখিটার গলাটা আরও নিচু, জোরাল, তার গানটাও বেশ দীর্ঘ। খাদের পর্দার কঠিন সুরগুলো বেশ জোর দিয়ে লাগাচ্ছিল, উঁচুতে উঠেও গলা একবারও ভাঙেনি। পাখিটা অনেকটা দূরে ছিল, কিন্তু তবুও মনে হচ্ছিল যেন ঐ মাঠের ধারেই কোথাও গাইছে। চমৎকার গাইয়ে।

কিন্তু তৃতীয় পাখিটা যখন দলের গানে যোগ দিল — তখন আমাদের যা অবস্থা!

সে পাখিটা আরও অনেক দূর থেকে গাইছিল — প্রান্তরের অপর পারে, ঘন উইলো আর অল্‌ডার গাছের জঙ্গলের ভিতরে — কিন্তু তার সমৃদ্ধ জোরাল গলা ল্যাওরেলের চীৎকারকেও অনায়াসে ডুবিয়ে দিল। এই তো গাইয়ের মত গাইয়ে!

গলার কী অপূর্ব কাজ! কী চমৎকার স্বরবৈচিত্র্য, নরম ক্ষীণ কাঁদিয়ে দেওয়া নিচু সুর থেকে সোজা একেবারে উঁচু পর্দার তীব্র কাজ; লোকে যাকে বলে 'বনপরীদের বাঁশির স্বর'।

পাখিটা খুব খাদে ক্ষীণসুরে গাইতে গাইতে হঠাৎ 'হুইউ-য়েৎ' — একেবারে উঁচু পর্দায় কেটে পড়ল!

— শুনছ? — স্মিরকাকে জিজ্ঞেস করলাম।

— এ আর এমন কি! — কিছুই যেন হয়নি এমনি ভাব করে ও বলল। কিন্তু বেশ বোঝা গেল, ওরও গান শুনে খুব আনন্দ হয়েছে। ইস্কুলে উপকথায় যে নাইটিংগেলের কথা ও পড়েছে, তার কথা ওর মনে হয়েছে: — 'সংগীত শিল্পের অপরাজেয় গুণী'।

আমার মনমরা ভাবটা আর রইল না। তার বদলে নিজেরই খুব গান গাইতে ইচ্ছে করল, ইচ্ছে হল আরো বাঁচতে, যতদূর সম্ভব আনন্দে বাঁচতে!

স্বপ্ন ভাঙল। জলপাই সবুজ রঙের ডিমটা আমার হাতের তালুর উপর: আমাদের গাইয়ের একটি শাবক এর ভিতরে ঘুমিয়ে আছে। হয়ত এই ঠুনকো খোলার ভিতরে ঐ রকমই অপূর্ব সুরের মন্ত্র সুন্দর করে গাঁথা হয়েছে।

নাঃ, জঙ্গলের সেই বাসাটার এটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসাই ভাল।

ঝোপের ভিতর থেকে স্মিরকার চীৎকার আর তার বোনের তীক্ষ্ণস্বর শুনতে পেলাম, সেই সঙ্গে একটা পাখির কর্কশ চ্যাঁ চ্যাঁ আওয়াজ।

তাড়াতাড়ি ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে গেলাম, কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

—দেখ! —স্মিরকা চেঁচিয়ে বলল। —আমার হাতের সই কী রকম দেখ! একেবারে সোজা কপালের মাঝখানটায় মেরেছি!

তার বোনটা হেসে উঠে নোংরা আঙুলগুলো দিয়ে ছোট্ট কুসুমটা মুখে মাখতে লাগল।

ঝোপের নিচের পরিচিত বাসাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তার ভিতরে কিছুই নেই।

—কী করলে বল তো? —হতাশভাবে বললাম। —কালকে যে নাইটিংগেলের গান আমরা শুনছিলাম, এটা যে তারই বাসা।

—না, না! —স্মিরকা সোল্লাসে বলল। —ঝোপের ঐ ছোট্ট পাখিটার বাসা এটা— ঐ যে চ্যাঁ চ্যাঁ কান্না শুনতে পাচ্ছ!

সত্যিই একটা ছোট্ট ছাই রঙা পাখি করুণস্বরে চ্যাঁ চ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল।

স্মিরকা কী করে জানবে যে বাসা ভেঙে যাওয়ার দুঃখে সেই বিখ্যাত 'গানের রাজার' গলা এরকম কর্কশ হয়ে গেছে? অধিকাংশ ছোট ছেলেরা, অনেক সময় তাদের বাপদাদারাও এরকম বাসা পেলেই ভেঙে ফেলে, তাই স্মিরকাও যে ওরকম একটা অত্যন্ত সাধারণ গোছের পাখির বাসা ভেঙে ফেলবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

আমাদের সেই ওস্তাদ গাইয়ের গান এর পরে আর কখনো শুনিনি—নাইটিংগেলটা ঝোপ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

ফুঁ দিয়ে ডিমের ভিতরের সবকিছু বের করে ফেললাম।

এর থেকে আর কোনো গাইয়ের জন্মা সম্ভব নয়: গোলাপী রং উপে গেছে। কিন্তু জলপাই রংটা নষ্ট হয়নি—সেটাকে সযত্নে আমার সংগ্রহে রেখে দিয়েছি।

কিন্তু ঠিক করেছি ওটাকে সহরে নিয়ে যাব না। শরৎকালে স্মিরকা আর তার বন্ধুর গাঁয়ের যে ইস্কুলে পড়তে যাবে, ডিমটাকে সেখানেই রেখে যাব। হয় তো তার ফলে ওরা আর কখনো নাইটিংগেলের বাসা ভাঙবে না।

দুই বসন্ত

শীতকালের লেনিনগ্রাদে দেখবার বা শোনবার মত কিছুই নেই। একদিন অবশ্য ছাদের উপরে কয়েকটা চড়াই পাখিকে ঝগড়া করতে দেখলাম। বুঝলাম বসন্ত আসছে; চড়াইদের প্রথম কচকচিই হল তার পূর্বলক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যা যা ঘটছে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে সুরু করলাম। এই সময়ে বসন্তের নানা ইঙ্গিত ক্রমেই বেড়ে উঠবে। বসন্তের পাখির প্রত্যেকটি নতুন স্বর একেকটি উপহার বিশেষ। এই সব নতুন স্বর একটি বিরাট সমবেত গানে মিশে যাবার আগেও শুনতে কী আনন্দ! সে ঐকতান প্রকৃতি আর সূর্যের স্তব!

বসন্তের আগমনীর এই আনন্দে মানুষেরও যোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু সেই আনন্দ প্রায়ই একটি প্রশ্নে মারা পড়ে: এই সুখের দিন আমার জীবনে আর কটাই বা আসবে?

তাই একবার ঠিক করেছিলাম, সময়কে চুরি করে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

ভাবলাম: জীবনের কাছ থেকে একটা বাড়তি বসন্ত কেড়ে নিলে কেমন হয়! আমার এই জন্মভূমি বিরাট দেশ, তার একেক অংশে একেক সময়ে বসন্ত আসে।

ককেশিয়ায় গেলে হয়। এখন এই ফেব্রুয়ারীর শেষেই ওখানে বসন্ত এসে যাবে। দক্ষিণের বসন্ত ক্ষণস্থায়ী, তাই ককেশিয়ার বসন্তকে অভ্যর্থনা করে ফিরে এসে এখানে দ্বিতীয় বসন্তের দেখা পাব—আমাদের উত্তরের বসন্ত দেরীতে আসে।

একথা ভেবেই মুখ রাঙা হয়ে উঠল,—এ যেন ভাগ্যকে ঠকাবার মতলব।

ঘটনাক্রমে আমার হাতে যে কাজটা ছিল সেটা সেই সময়েই ফুরিয়েছে। আরেকটা কাজ সুরু করার আগে কোথাও গিয়ে বিশ্রাম করার অবসর আমার ছিল।

তুয়াপ্‌সের একটা টিকিট কিনে ট্রেনে চড়লাম। তিন দিন পরে সকালবেলা ঘুম ভেঙেই দেখি: বসন্তকাল!

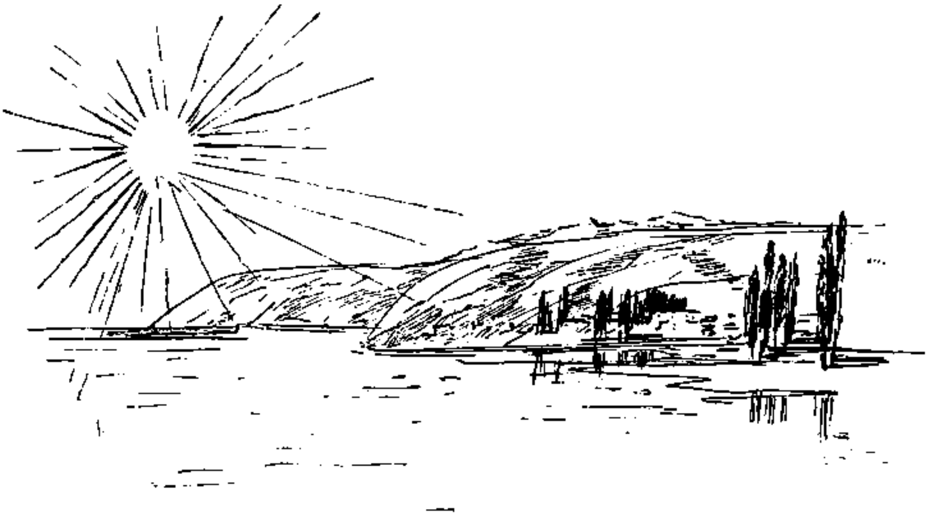

তুয়াপ্‌সের পথঘাট তখনই বেশ গরম, জায়গায় জায়গায় ধুলো উড়ছে, কিন্তু চারপাশের পাহাড়ে তখনও বরফের ঝলক রয়েছে। সুন্দর লাল-বুক ফিঞ্চ পাখিরা বাগানে বাগানে গলা খুলে গান জুড়েছে।

পাখিগুলো যে সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে, তা অনায়াসেই আঁচ করা যায়। তাদের দলে একটাও মেয়েপাখি ছিল না। শক্তসমর্থ পুরুষরা আগেই এসে গেছে, মেয়েরা পরে আসবে।

তখন মাত্র মার্চের পয়লা তারিখ, কিন্তু পাছে দেরী হয়ে যায় তাই তাড়াহুড়ো করতে হল।

'আব্‌খাজিয়া' স্টীমারটি বড় সুন্দর, তাতে চড়ে ককেশিয়ার তীরের আর বিস্তৃত সমুদ্রের চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম।

উত্তরে আমার জন্মভূমির সঙ্গে শেষ সম্পর্কটিও ছিন্ন হয়ে গেল। এখন অন্য দেশে এসে পড়েছি: সুন্দর দেশ, হাতছানি দিয়ে ডাকে, কিন্তু তবুও অপরিচিত।

জেটীর উপরে বড় বড় কালো রঙের পাখি প্রুশীয় ঈগলের মত ডানা ছড়িয়ে বসেছিল। ওগুলো কর্মোরাণ্ট, আমাদের অঞ্চলে পাওয়া যায় না। অদ্ভুত দেখতে একরকম জীব ঢেউয়ের

মধ্যে থেকে লাফ দিয়ে আবার জলেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। ডল্‌ফিন্‌—লেনিনগ্রাদ বা মস্কোর চিড়িয়াখানাতেও এদের দেখা যায় না। ফিকে গোলাপী রঙের এক ঝাঁক গাংচিল জাহাজটার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল, গোলাপী বুক সমুদ্রের পায়রা, তাদের লাল লাল পা আর লাল ঠোঁট দেখতে মোটেই আমাদের অঞ্চলের গাংচিলের মত নয়।

জাহাজ তার চাকায় দেশ ও কালকে মন্থন করে এগিয়ে চলল।

গাগ্রীতে পেঁৗছলাম।

অভ্রংলিহ পাহাড়ের ফাটলের গায়ে ঘন মেঘ জমে আছে—মনোমুগ্ধকর ছবি। পাহাড়ের মাথায় বরফ ঢাকা ফার গাছের বন—সাইবেরিয়ার একটা বন যেন তুলে আনা হয়েছে। তীরের গায়ে সরু সারিতে মৌচাকের মত ছোট ছোট কুঁড়েঘর, তাদের সামনে পাম, সাইপ্রাস, ইউকেলিপ্টাস।

সময় আর জলের স্রোত নিঃশব্দে বয়ে চলেছে।

এসে পেঁৗছলাম সুখুমিতে।

এই সুন্দর সহরটি একবার দেখলে আবার ফিরে আসতে ইচ্ছা হয়।

একবার একটা শরৎকাল সুখুমিতে কাটিয়েছিলাম। প্রত্যেকেই সুখুমিতে খুব অল্পসময়ের জন্য এলেও সেখানকার মিশুকে অতিথিপরায়ণ লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলে। আমিও করেছিলাম।

সেই সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুখুমিতে নামলাম।

কিন্তু যে দেশে শীত নেই সে দেশের বসন্ত বসন্ত নয়।

রাস্তায় চলতে গরম লাগে, কোট পরার কোনই দরকার নেই।

আলেক্সেয়েভ ক্যানিয়ন পর্যন্ত গিয়ে 'সারা-ইউনিয়ন চারাগাছ প্রতিষ্ঠানের' বাগানে গিয়ে ঢুকলাম, চারিদিকে বুলবুলির গান। আমাদের উত্তরাঞ্চলের সাদা বার্চের বনে দক্ষিণের ঐ সোনালী ঠোঁট কালো বুলবুলির গান: একবার কল্পনা করে দেখ!

কিম্বা পাহাড়ে নদীর ধারে জঙ্গলের উপর বসে থাকা মাছরাঙা—সবুজ পান্না, খয়েরী আর নীল রঙের তার সাজ।

প্রতিদিন নতুন নতুন পাখির ঝাঁক আসতে দেখা গেল। এসেই তারা ব্যস্ত হয়ে বাসা বাঁধার কাজে লেগে যায়—বাড়িতে ফিরে এসেছে যে।

মেয়েফিঞ্চরাও ছিল, কারণ এখানেই পুরুষদের সঙ্গে তারা ঘর বাঁধে।

তারপর, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বরফ পড়তে সুরু করল। একেবারে খাঁটি উত্তরের বরফ, তার সঙ্গে রয়েছে ঠাণ্ডা তীব্র হাওয়ার গর্জন। 'বাপপিতামহের আমলেও কখনও এমন দেখিনি' এই চিরায়ত কথাটি মার্চের এই আবহাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রযোজ্য।

পরের দিনও বরফ গল্‌ল না। 'রিত্‌সা'র খাবারের তালিকায় একটা নতুন জিনিস প্রথম আবির্ভূত হল—বুনো মোরগের রোস্ট।

বরফ আর বনমোরগ তৃতীয় দিনেও থামল না।

সহরটাকে চেনার উপায় নেই: পাম গাছগুলোর গোদা গোদা পা বরফের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে। বিরাট বিরাট কলাপাতাগুলো ভারে মাটিতে নুয়ে গেছে। কাকগুলো বরফে ভিজে গিয়ে ইউকেলিপটাসের খোলস ছাড়ান রুক্ষ ডালে বসে আছে (অস্ট্রেলিয়ার এই গাছটি সাপের মত প্রতি বছর খোলস ছাড়ে) আর কর্কশ গলায় চীৎকার করছে।

এক দঙ্গল ছেলে, হাতে লাঠি সোঁটা নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলল, আমিও তাদের দলে যোগ দিলাম।

অজস্র মরা বন মোরগ ঝুলিয়ে নিয়ে শিকারীরা সব আমাদের পার হয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে তোমাদের কী বক্তব্য? দেশে, উত্তরে ত বড় বড় বিষণ্ন চোখ, সুন্দর গোধূলির পাখি শিকারীদের কাছে সব সময়েই এক দুর্লভ পুরস্কার। বরফ পড়ামাত্রই এরা পালায়। শীতকালটা ওরা এদেশেই পাহাড়ের ঢালুতে, সমুদ্র তীরে আর বড় বড় পাতায় ঠাসা বনে কাটায়। ওদের লম্বা ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাবার সংগ্রহ করার জন্য নরম গভীর মাটি প্রয়োজন। বরফ হল ওদের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

পাহাড়গুলো বরফের পুরু কম্বলে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় বন মোরগগুলো নিচে একেবারে রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে। খেতে না পেয়ে ওদের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল, ছেলেরা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বন মোরগ মারছিল।

আমি একটাকে কোনরকমে বাঁচাতে পারলাম। মোরগটা উড়তে পারছিল না, আমি হাত দিয়ে ধরেই ফেললাম। পরে পরীক্ষা করে দেখলাম, বেচারীর বাঁ পায়ে মাঝের সবচেয়ে বড় আঙুলটার বদলে শুধু গোড়াটুকু ছিল। বড় খারাপ লাগল দেখে।

বাড়িতে এনে মোরগটাকে বাগানের যেখানে বরফ প্রায় গলে গেছে সেখানে ছেড়ে দিলাম। বন মোরগটা তিন দিন বাগানে ছিল, তারপর এক রাত্রে উড়ে পালিয়ে গেল।

বরফ গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুখুমিতে গ্রীষ্ম এসে পড়ল। ও অঞ্চলের ফিঞ্চগুলো ততক্ষণে জোড় বেঁধে বাসা বানিয়ে ফেলেছে। বসন্ত শেষ।

বাড়ি ফেরার সময় হল।

লেনিনগ্রাদে তখন তুষার ঝঞ্ঝা চলছিল।

গ্রামের দিকে যেতে এপ্রিলের শেষ দিক হয়ে গেল। সঙ্গে আমার এক দক্ষিণী বন্ধুও ছিল, সেও শিকারী। বসন্তে আমাদের বনে অনেক বন মোরগ আসে — এটা বেশ একটা গর্ব করে বলার মত ব্যাপার।

আমাদের অঞ্চলের বনে এসে মনে হল পৃথিবীটাকে খুব জোর চক্কর মারতে মারতে যেন নিজের সঙ্গেই ধাক্কা খেলাম।

আবার গাছে গাছে ফিঞ্চদের পিং পিং শুনতে পেলাম। এখনও ওরা জোড় বাঁধেনি। বন মোরগগুলো ঝোপের উপর বসে ছিল, তাদের লম্বা লালচে ল্যাজগুলোর রঙের কী বাহার। এই কয়েকদিন আগেই অন্য দেশে যা দেখেছি তাই আবার ফিরে দেখলাম।

আমরা ত গেলাম বন মোরগ শিকারে। বনের এক দিকে দাঁড়ালাম আমি, আমার বন্ধু দাঁড়াল দশ পা দূরে।

সূর্য ডুবল, পাখিরা সব নিশ্চুপ।

এইটেই পয়লা নম্বর বন মোরগটার আসার সময়। কিন্তু সেটা ত এল না।

নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'এখনও বেশ আলো আছে। আকাশটা দিব্যি ফসা — পরে আসবে।'

বসন্তের এই সময়টায় বনের মধ্যে এলে মন আকুল হয়ে ওঠে। শ্বেত রাত্রি — উত্তরের বিবসনা কন্যা — ধীরে ধীরে ঘুম তাড়িয়ে দেয়। বার্চ গাছের সাদা গা, আস্পেন গাছের রুপোলী কাণ্ড কী এক রহস্যের মধ্যে দিয়ে জীবন ফিরে পায়। উন্নত, ঋজু পাইন গাছ তার কণ্টকিত প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। আর নগ্ন বনের অন্তরে প্রাচীন ঘুমন্ত ফার গাছগুলো রহস্যজনকভাবে ঘন অন্ধকার হয়ে ওঠে। এই সময়েই পৃথিবীর অতৃপ্ত প্রেমের কামনা স্যাঁত-সেঁতে মাটি থেকে উঠে আকাশের গায়ে চমকানো ম্লান তারাদের দিকে হাত বাড়ায়।

এমন রাত্রে পাখিরা ঘুময় না। সূর্যের কাছ থেকে তারা নিঃশব্দ বিদায়বাণী গ্রহণ করে, কিন্তু বেশিক্ষণ নিজেদের সংযত রাখতে পারে না। ফার গাছের ছুঁচলো ডগা থেকে ধূসর

বুলবুল আর গাইয়ে বুলবুলের দলের গান ফেটে পড়ে। কালো চোখ রেড্‌ব্রেস্ট গলা খোলে, সদ্য দেশে ফেরা কোকিল রাত্তিরে প্রবল আবেগে ধরা গলায় হঠাৎ ডেকে ওঠে।

শুধু শুধুই ও মেয়ে কোকিলের আনন্দের হাসির অপেক্ষায় রয়েছে। মেয়ে কোকিল এখনও এসে পোঁছয়নি, তবে আসবে, বন যখন তার পাতার বেশবাস পরবে তখন...

কোথায় যেন কসাচ্‌ — এক্ধরণের বন মোরগ — ডাইনীদের মন্ত্র পড়ার মত বিশ্রী সুরে ডেকে চলেছে।

এই সব নানা আওয়াজের মধ্যে বন মোরগের 'খোর-খোর' আর 'ত্‌সির-ত্‌সির' শব্দ শোনার জন্য আমি কান খাড়া করে রেখেছিলাম। সূর্য ডোবার মিনিট পনেরো পরেই সাধারণতঃ বন মোরগরা মাটি থেকে উঠে বনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উড়ে উড়ে সঙ্গিনীদের খুঁজতে থাকে। ওই ওড়ার শব্দকেই বলা হয় 'ড্রামিং'।

কখন 'খোর-খোর' সুরু হয় তার জন্য উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মনে পড়ল আগের বসন্তে ঠিক এই জায়গাটাতেই আলোয় ভরা রাত্রে দাঁড়িয়ে ছিলাম, মাথার উপর দিয়ে প্রায় ডজনখানেক লম্বা ঠোঁট পাখি উড়ে যাচ্ছিল, একটাও পাছে ফস্‌কে যায়, সেই ভয়ে দশ বার বারেরও বেশি বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপেছিলাম।

কিন্তু আজ কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। এবারের বসন্তে কী যেন হয়ে গেছে। এবার বন মোরগের শব্দ খুব বেশি পাব না, কারণ তারা আসতে দেরী করেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ শুনতে পেলাম — 'ড্রামিং'এর জন্য একেবারে উদগ্রীব হয়ে থাকলে সব সময়েই যেমন শোনা যায় — ক্ষীণস্বর 'ৎসিপিৎ, ৎসিপিৎ, ৎসিপিৎ, খোর, খোর।'

সঙ্গে সঙ্গে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেদিকে ঘুরে তাকালাম। দেখলাম: আমার বন্ধু যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই একটা পাখি ঝট্‌কা মেরে উড়ে যাচ্ছে, শ্যামল সন্ধ্যার বুকে ঘন কালো পাখিটা।

কী অদ্ভুতভাবে উড়ছে পাখিটা, মনে মনে ভাবলাম। সামনের দিকে রয়েছে লম্বা নামান ল্যাজটা, আর পাখিটার মাথা নেই!

তারপরেই ভুল ভাঙল: যেটাকে ল্যাজ ভেবেছিলাম, সেটা আসলে বন মোরগের লম্বা ঠোঁট, মাথা নিচে নামিয়ে ভাল করে সব খুঁজে পেতে দেখছে।

দেখলাম বন মোরগটা হঠাৎ গুটিয়ে গিয়ে একটা বলের মত হয়ে গেল — এখন আর কোনটা ল্যাজ আর কোনটা মাথা তা আলাদা করা যাবে না — তারপর নিচে পড়ে গেল।

তখন বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলাম। 'যাক', আমার বন্ধুকে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হবে না ভেবে আনন্দ হল। 'একটা হল। এটাই তার মানে সুরু, এখনি আরও আসবে।' কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। বন অন্ধকারে ঢেকে গেল, গাছগুলো সব আঁধারে ল্যাপা পোঁছা হয়ে গেল। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, সঙ্গিনীর উদ্দেশে কোনও বন মোরগের ডাক আর শুনতে পেলাম না।

আর অপেক্ষা করে লাভ নেই দেখে বন্ধুকে ডাকলাম।

সে একটু রাগতভাবে বলল, 'এই বুঝি তোমার বহুরচিত বহুবিখ্যাত ড্রামিং। একটা মাত্র পাখি পেলাম — এইটে। ককেশিয়ায় শীতকালে এবার অজস্র মেরেছি।'

বন্ধু মরা বন মোরগটা আমার হাতে দিল। পাখিটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম সেটার বাঁ পায়ে মাঝের বড় আঙুলটা নেই, তার জায়গায় আঙুলের গোড়াটুকু রয়েছে।

চমকে উঠলাম।

হাজার হাজার মাইল দূরে সুখুমিতে যে এই পাখিটারই জীবন রক্ষা করেছিলাম, তা অবশ্য আমি একেবারে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারিনি। কিন্তু এটা সত্যি যে আমাদের উত্তরের বন মোরগরা শীত কাটায় ককেশিয়ায়, আর সেখানে ককেশীয় জাতের পাখির সঙ্গে তাদের রক্তের সংমিশ্রণও ঘটে।

সুখুমির শিকারীদের সারা গায়ে মরা বন মোরগ ঝুলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ল।

বোধ হয় আমাদের উত্তারাঞ্চলের বন থেকেই বড় বড় বিষণ্ণ চোখ বন মোরগরা শীতকালে সুখুমি সহরের নিকটবর্তী তুষার মুক্ত বনের বড় বড় পাতার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তা সম্ভব, খুবই সম্ভব।

'আমার জন্মভূমি' কথাটির মর্ম তখন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলাম। এই পৃথিবীর বুকের কী বিরাট অংশ জুড়ে আমাদের দেশ, আর তার সবটাই — উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম — একটি বিরাট সম্পূর্ণ সত্তা।

আবার পাখির কথায় ফিরে আসা যাক: মনে রেখ শীতকালে দক্ষিণাঞ্চলে যদি অনেক পাখি মার, তবে উত্তরাঞ্চলে বসন্তকালে কিছুই মারতে পারবে না।

রাত্রে যারা লুকিয়ে আসে

একটি মাত্র শব্দ ধরে দেয় রাত্রির রহস্য!
আ. ব্লক

শিকার করে ফিরছি। সূর্য সবে অস্ত গেছে, বন দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু তখনও ফাঁকা মাঠে শিকার করার পক্ষে যথেষ্ট আলো আছে। তাই বন ছেড়ে মাঠে এসে জালিভাইকে ছেড়ে দিলাম।

খরগোস তখনও বাইরে ঘোরে, বলা যায় না, ফিরতি পথে এক আধটা যদি পেয়ে যাই!

ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ আর আমি শ'খানেক ফুট যেতে না যেতেই আমাদের কুকুরের সূক্ষ্ম বোধ শক্তি গন্ধ পেল। কুকুরটা ডেকে উঠে দৌড়ে শিকার খুঁজতে চলে গেল।

আমরা দুজনে দুদিকে দাঁড়ালাম: ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ ডাইনে — বনের ধারে, আমি বাঁ দিকে — রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট উঁচু কবরের ঢিবির উপর। খরগোসটা যে পথেই পালাক না কেন বনের মাঝখানের এই সরু চিমটে পথ ওকে পার হতেই হবে।

একটা ছোট্ট ঝোপের কাছে বেশ আরামে বসে বন্দুকটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে চারিদিকটা একবার দেখে নিলাম।

পরিষ্কার আকাশ। 'যোদ্ধার ঢালের মত' কমলা রঙের পূর্ণিমাচাঁদ ঠিক সেই সময়েই গাছের মাথায় বেয়ে বেয়ে উঠছিল। গাছ তলায় শিশির মাখা সবুজ অঙ্কুর মাথা তুলেছে। অক্টোবরের প্রথম দিকের এই সন্ধ্যাগুলো বড় সুন্দর, বড় চমৎকার!

কুকুরটা এদিকে শিকারের পিছুনে ছুটতে ছুটতে রাস্তার ডান দিকে মাঠ ছেড়ে মাইল দুয়েক চলে গেছে।

অতদূর থেকেই কুকুরের ডাক আসছিল। কিন্তু খরগোসটা গেল কোথায়?

খরগোসটা যে শীতের খরগোস সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। সাদা খরগোস কখনও অমন বিরাট চক্কর মারে না, সাদা খরগোস তাড়াতাড়ি বনে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করে।

এমনও হতে 'পারে, খরগোসটা যেমন পাগলের মত দৌড়চ্ছিল, হয়ত কুকুরটাকে হারিয়ে দিয়ে ওটা এখানেই ধারে কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে।

সিগারেটে তাড়াতাড়ি দুটো টান মেরে গোড়ালি দিয়ে সেটাকে থেঁৎলে দিয়ে, বন্দুকের সেফ্‌টি ক্যাচ্‌টা খুলে ফেললাম।

জালিভাই-এর সোৎসাহ মুদারার স্বর গ্রামের সব কুকুরদের ক্ষেপিয়ে দিল, তারাও চেঁচাতে লাগল। তখন যৌথখামারের বুড়ো পাহারাদার কুকুর সিন্‌গাল ভাঙা মোটা গলায় সে দলে যোগ দিল।

কুকুরদের উন্মত্ত সমবেত গানে সন্ধ্যা ভরে উঠল—কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। জালিভাই হঠাৎ থেমে গেল, তারপর এক এক করে সিন্‌গাল আর গ্রামের অন্য কুকুর-গুলোও তাকে অনুসরণ করল। সবকিছু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কুকুর নিয়ে শিকারে গেলে তার ডাক শোনার জন্য কান খাড়া করে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এক প্রাণীকে আরেক প্রাণীর তাড়া করার মারাত্মক ব্যাপারের উত্তেজনায় শিকারী কেবল অন্যের মারফতে অংশগ্রহণ করে। শিকারে শিকারীর অংশ যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি অধিকাংশ সময়েই একঘেয়ে: যদি অপেক্ষা করার জায়গাটা ঠিকমত বাছা যায়, তবে তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসা জন্তুটা সোজা সেই দিকেই আসবে আর তখন তার পালিয়ে বেড়ান চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দেওয়ার চেয়ে সহজ কাজ আর কিছুই নেই।

জালিভাই-এর আর সাড়াশব্দ নেই, তার মানে গন্ধের সূত্র সে হারিয়ে ফেলেছে। এখন তবে কুকুরটা চক্কর মেরে ভীত ক্লান্ত খরগোসটার পথের সন্ধান আবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

খরগোসটা তখনও নিশ্চয়ই দৌড়ে চলেছে, এই হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় প্রতারিত হবার পাত্র সে নয়। এতক্ষণ যে তাড়া করছিল সে রক্ত পিপাসার উত্তেজনায় প্রচণ্ড চীৎকার করে নিজেই নিজের সন্ধান জানিয়ে দিয়েছে, তার এই চুপ করে যাওয়া হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে একেবারে খরগোসটার ঘাড়ের উপর পড়ার ভূমিকাও হতে পারে।

কাজেই খরগোসটা যে কোন বিরাট চক্রে পাক খেয়ে চলেছে, তা একমাত্র ও নিজেই জানে। এই বৃত্তের মধ্যেই ওর জন্ম, তার মধ্যেই রাত্রে বেরিয়ে খাবার জোগাড় করেছে, দিনের বেলা ঘুমে ঢুলেছে, ভালবেসেছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করেছে, শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে এসে আবার এর মধ্যেই ঢুকেছে। ওকে এই সীমার বাইরে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র মৃত্যু।

খরগোসটা হয়ত কুকুরটাকে বহুপিছনে ফেলে রেখে কাছাকাছি কোথাও ভয়ে কাঁপা কানদুটো খাড়া করে গুঁড়ি মেরে বসে আছে।

আর কোনও শব্দ না পেলে, এক লাফ মেরে বনের মধ্যে পালিয়ে যাবে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সে পথে ফিরে যাবে, পাশে বিরাট বাঁক নিয়ে পথ ছেড়ে একেবারে বনের ধারে চলে আসবে, তারপর সেখানেই লুকিয়ে পড়বে, মাথাটা থাকবে মাঠের দিকে।

তাই যদি হয় তবে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি: যতক্ষণ না কুকুরটা ডাকতে ডাকতে দৌড়ে তাকে পার হয়ে তার পথ ধরে বনের মধ্যে ঢুকছে, ততক্ষণ সে চুপ করে অপেক্ষা করবে। তারপর লাফ মেরে মাঠের দিকে দৌড় মারবে।

আমিও তবে কিছুটা আরাম করে নিতে পারি। আমার সর্বচেতনা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল: তার একটা অংশ সতর্ক হয়ে রইল, কোনও কম্পিত ছায়া দৌড়ে পালিয়ে যায় কিনা দেখবার জন্য চোখদুটি সজাগ রইল। সেই সঙ্গে শিকারের উন্মাদনায় উত্তেজিত আমার স্নায়ু ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার সৌন্দর্যেও সাড়া দিয়ে চলল।

কী অপূর্ব দৃশ্য। নগ্ন গাছগুলির পুঞ্জ অন্ধকার, নিচে সবুজ কচি অঙ্কুর: সুন্দর দ্বারপ্রান্তে বসন্ত এসে মাঝ শরতের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

চারপাশের সব কিছুই যেন রূপকথার সাজসজ্জা: সবকিছু—ঝোপঝাড়, গাছপালা, গ্লেশিয়ারের সমুদ্র থেকে প্রাচীন পাথর মাঠের এখানে ওখানে চাকা চাকা কালো দাগের মত মাথা তুলেছে। চাঁদের আলোর রোশনাই মন আকুল করে তুলেছে, রূপোলি রাত্রিকে তার গোপন কথার প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছে।

তখন খেয়াল হল দাঁড়িয়ে আছি একটা উঁচু কবরের উপর। রাত্রের অশরীরী ছায়াদের রূপ দেবার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।

এই সব কবরের ঢিবিগুলোর ভিতরে রয়েছে পুরনো দিনের যোদ্ধারা। রূপোলি সন্ধ্যায় মনে হল যেন কম্পিত ছায়া দেখতে পেলাম — শিরস্ত্রাণ আর তলোয়ার, বর্শা আর ঢাল হাতে

যোদ্ধারা। চোখের সামনে এক ভীষণ, হাতাহাতি যুদ্ধ নিঃশব্দে ঘটে গেল: অস্ত্র ঝলসে উঠল, সৈন্যরা মারা পড়ল।

তেহিনো দিবসা গতাঃ! সে সব দিন চলে গেছে। আমাদের পূর্ব পুরুষরা তাঁদের বিখ্যাত সৈন্যদের কী করে বিশ্রাম দিতে হয় তা জানতেন।

চাঁদের উজ্জ্বল মুখের উপর দিয়ে একটা পাৎলা মেঘ দ্রুত সরে গেলে পর দেখলাম, আমার সামনে কেবল কচি সবুজ গাছপালা বিছনো রয়েছে, আর পায়ের তলে ছোট, গোল ঢিবিটা।

তখন জালিভাইয়ের কথা মনে পড়ল, এতক্ষণ ধরে চুপ করে আছে দেখে অবাক হলাম।

খরগোসটা ঠিক এই মুহূর্তে কী ভাবছে তা জানতে ভারি ইচ্ছে হল।

কিন্তু রাত্রির সেই ডাইনীর যাদু নানারকম সব অদ্ভুত ভাবনা ডেকে আনল। তার ফলে মনটা খরগোসের কাছ থেকে আবার আমার কাছেই ফিরে এল। যদি কোনও ভীষণ জন্তু তার ভাঁটার মত চোখ নিয়ে, হিংস্র দাঁত বের করে আমার পিছনে পিছনে দৌড়ত, তবে কেমন হত?

সেই গুহায় পাওয়া ভাল্লুকের ফসিলটার মত বিরাট কিছু?

যদি ছোট ছেলে হতাম, তবে নিশ্চয়ই এই চিন্তাতেই ভয়ে কেঁপে উঠে ঠিক একবার পিছন ফিরে তাকাতাম। কিন্তু এখন কেবল করুণভাবে হাসলাম।

মাঠের অপর পারে, কে যেন কুঁড়েঘরে একটা দীপ জ্বালাল: যৌথখামারের শান্ত গ্রাম ঘুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, বিপদের কোনও চিন্তা তার ধারে কাছেও নেই।

এখানে সবচেয়ে বড় আর ভীষণ জন্তু যা আসতে পারে তা হল শেয়াল।

বছর পাঁচেক আগেই শেষ ক্ষুদে ভালুকটি দেখা গেছে এবং তাকে মারাও হয়েছে। নেকড়ে বাঘ যে কত বছর ধরে দেখা যায় না তা কারো মনেও নেই।

এইখানেই, বহুদিনের শিকারী ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ আর আমি, বুনো জন্তুর আশায় চোখ আর কানের পরিশ্রম করেই চলেছি। কোন জন্তুর জন্য লুকিয়ে আছি, না, খরগোস! ভেবে হাসি পেল।

আমরা দুজনে মিলে বয়সের দিক দিয়ে বোধ হয় একশ বছর ছুঁতে পারি। ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ একজন নাম করা শিকারী, বিশিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞানী। আমিও

বয়সকালে, তাইগা আর তুন্দ্রায় বহুদিন কাটিয়েছি, বুনো জন্তুকে খুব কাছ থেকে জেনেছি।

আমরা দুজনেই প্রাণিবিদ্যার ছাত্র: যে সব জমির ভিতর বাহির জরীপ করা হয়ে গেছে, সেখানে আমাদের পক্ষে বিস্ময়কর, অজানা কিছুই থাকতে পারে না। ছেলেবেলার সেই সব দিন কোন দূরে হারিয়ে গেছে যখন গ্রামের বাইরের ছোট্ট জঙ্গলও মনে হত কত সব অত্যাশ্চর্য জিনিসে পূর্ণ: নামহীন জন্তু আর তার সঙ্গে দৈত্যদানো, জলপরী আরও কত সব কল্পিত প্রাণী, ঠিক আমাদেরই মত বাস্তব। আমাদের উপর রূপকথা তার সেই প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেছে, তার রহস্যের মোহনীয়তা আর নেই: এখানে এমন কোনও প্রাণী নেই যার প্রত্যেকটি চলাফেরা, আচার ব্যবহার আমাদের অজানা।

হঠাৎ বাঁ পাশে বনের মধ্যে একটা চাপা, কর্কশ চীৎকারে চমকে উঠলাম।

যদি মাটিতে গভীরভাবে পোঁতা শ্যাওলা ঢাকা পাথরগুলোর কথা বলার শক্তি থাকত, তবে ঠিক এই রকমই আওয়াজ করত। এটা যে কোনও বন্য জন্তুর ডাক সে বিষয়ে আমি তখন নিশ্চিত, জন্তুটার নাম কিন্তু সেই মুহূর্তে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তখন শুনছি: চীৎকারটা নিশ্চয়ই আবার হবে, তবেই বুঝতে পারব কিসের ডাক।

তার বদলে, সেই একই দিক থেকে জালিভাইয়ের পাগলের মত ডাক শোনা গেল। বেশি দূরে নয়, আমার বাঁয়েই। কুকুরটা গর্জন করছে!

খরগোসের গন্ধে কুকুর কখনও গর্জন করে না, আস্তে আস্তে ঘেউ ঘেউ করে।

আমার থলেতে দুটো বড় বুলেট ছিল: এটা আমার অভ্যাস — তাইগাতে যখন শিকার করতে যেতাম তখনকার অভ্যাস। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি বন্দুকের ছররা খুলে বুলেট ভরার সময় মোটেই পাব না: জালিভাই কাছেই রয়েছে। তার মানে বুনো জন্তুটা আরও কাছে।

দোনলা বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে আমার সামনের কালো দেয়ালটার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলাম...

একটা জন্তু, নেকড়ের সমান বড়, তার ধারে দেখা দিল।

লক্ষ্য ঠিক করেই বন্দুকটা নামিয়ে ফেললাম।

ওটা জালিভাই নিজে।

কুকুরটা নিঃশব্দে ঐ ফাঁকা জায়গাটুকুর এদিক ওদিক দৌড়তে লাগল। একেবারে ঢিবিটার কাছে এসে মাথা তুলে আমায় এক মুহূর্ত দেখে নিল। তারপরেই ডাকতে সুরু করল — নিশ্চয়ই গন্ধ পেয়েছে, কারণ আবার ডান দিকে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল।

এক মুহূর্ত পরে তার সাদা থাবাগুলো অন্ধকারে চমকে উঠে মিলিয়ে গেল।

ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, কুকুরটা সোজা সেখানে গেল, আমিও দমবন্ধ করে অপেক্ষা করে রইলাম: এই বার বন্দুকের শব্দ শোনা যাবে।

জালিভাইয়ের ডাক দূর থেকে দূরে চলে গেল, কিন্তু বন্দুকের কোনও আওয়াজ তার অনুসরণ করল না।

নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হল, তখন বুঝলাম যে এতক্ষণ দমবন্ধ করেছিলাম।

স্বীকার করছি আমার মোটেই ভাল লাগছিল না।

কুকুরটার হাবভাব ঠিকই আছে: জালিভাই গন্ধ শুঁকে শুঁকে অনুসরণ করে চলেছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই ঢিবিটা পার হয়েই ও গেছে, তার মানে জন্তুটা আমার সামনে দিয়েই চলে গেছে। জন্তুটার নাম আমার জানা নেই, অশরীরী প্রেতাত্মার মত সে নিঃশব্দে, অদৃশ্যভাবে পার হয়ে গেছে।

আমি তার শব্দ না পেলেও, তাকে না দেখলেও; সে আমায় নিশ্চয়ই দেখেছে। নিচ থেকে পরিষ্কার আকাশের গায়ে আমায় সহজেই দেখা যায়; তাছাড়া তার সহজাত প্রবৃত্তিই নিশ্চয় তাকে মানুষের উপস্থিতির বিপদসংকেত জানিয়েছে। নিশীথ হাওয়া আমার ডান কাঁধের উপর দিয়ে তার দিকেই বয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমার অলক্ষ্যে মাত্র কুড়ি ফুট দূর দিয়ে কোন্ জন্তু পালাতে পারে? ঝরা পাতায় এতটুকু শব্দও সে তবে করেনি!

কোন গুলির আওয়াজও হয়নি, তার মানে জন্তুটা ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচের সামনে দিয়েও তার অলক্ষ্যে চলে গেছে।

জালিভাই বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে তার ডাকও ক্ষীণ হয়ে এল।

হঠাৎ অনুভব করলাম ভীষণ গরম হয়ে গেছি, রাতটা কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা ছিল।

ব্যাপারটা যাই হোক, যা হবার তা হয়ে গেছে: জন্তুটা এখান দিয়েই চলে গেছে, আর কিছুতেই ফিরবে না।

সেফটি ক্যাচটা আবার পরিয়ে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিলাম, তারপর ঢিবি থেকে নামতে নামতে একটা সিগারেট ধরালাম।

রাস্তায় ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচের সঙ্গে দেখা হল।

—দেখেছিলে? —সে জিজ্ঞেস করল।

—সেইটেই ত অদ্ভুত ব্যাপার, আমি কিছুই দেখিনি।

—আমি দেখেছি, একটা ভীষণ কিছু। মনে হল যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। লম্বা লম্বা পা ফেলে চকিতের মধ্যে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। খুব কাছ দিয়েই।

—কিন্তু জিনিসটা কী?

—কল্পনাও করতে পারি না। ভাল করে দেখতেও পাইনি।

—গুলি লাগেনি?

—গুলি করার সুযোগই পাইনি।

—বাঃ, বেশ লোক ত!...

—ছোট গুলি দিয়ে তুমি কী করতে দেখতাম। খরগোস ত নয়।

—তা, কী হল শেষ পর্যন্ত?

—জন্তুটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কে যেন স্রেফ গিলে ফেলল। পাতার আওয়াজ অবশ্য হয়েছিল, বনের মধ্যে শুকনো কাঠিকুটো ভেঙে যাওয়ার শব্দও দুবার শুনতে পেয়েছি। শুনে ওকে যে কেউ তাড়া করছে তা মনে হল না, মনে হল ওই যেন কিছুকে তাড়া করে চলেছে।

ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ চুপ করে গেল। তখনই কেবল উপলব্ধি করলাম যে আমরা দুজনে কী কারণে যেন এতক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলছিলাম।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আমি সেই রাত্তিরে চারিদিকে যে চোখে তাকালাম, ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে তাকানোর চেয়ে তা সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টি। বয়সের কথা থাক, চাঁদ ওদিকে তখন সত্যিই তার মোহমন্ত্র বিছিয়ে দিয়েছে।

অল্প কুয়াসা ছিল, চাঁদ পৃথিবীর গায়ে শীতল রূপোলি ধূসর আভা মাখিয়ে দিয়েছে। জালিভাইয়ের সাড়াশব্দ নেই।

পৃথিবী, বন, আকাশ—এই সব অপূর্ব সুন্দর নির্বাক সৃষ্টি তাদের রহস্য ভরা নিস্তব্ধতায় আমায় অভিভূত করে দিল। ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচের মনেও সম্ভবত সেই একই অনুভূতি।

কিন্তু কেউ কিছুই বললাম না, বোধ হয় দুজনেই কথাবার্তা সুরু করতে পারছিলাম না, আলাপের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটাই যে হারিয়ে গেছে।

একটা জিনিস কেবল আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল: এটা কেমন করে হল যে আমি দেখতে পেলাম না আর ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ দেখেও চিনতে পারল না?

গ্রামে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল। চাঁদ তখন ঘন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে।

সেইখানে জালিভাই এসে আমাদের ধরল।

আমার কাছে এসে অদ্ভুতভাবে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল।

ও কি সেই হারিয়ে যাওয়া কথাটাই বলতে চায়? ও ত জন্তুটাকে দেখেছে, জেনেছে।

ওর পিঠে হাতটা রাখলাম, বুকের দুপাশ উঠছে নামছে, ভিজেও গেছে।

কিছু গোলমাল হয়েছে। দেশলাই জ্বালিয়ে হাতের দিকে তাকালাম। রক্তের দাগ।

ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ জালিভাইকে পরীক্ষা করে বিষণ্ণভাবে বলল:

—ভাগ্যের দৌলতে কুকুরটাকে ফিরে পেয়েছ। আঁচড়ের উপর দিয়েই গেছে।

বুঝলাম আমাদের 'অদৃশ্য জীবটির' থাবা আর দাঁত আছে, অশরীরীর তা থাকে না।

ফসল মাড়াইয়ের উঠোনের পিছনে একটা আগুন জ্বলছিল। রোঁয়াওঠা সিন্‌গাল আর যৌথখামারের বুড়ো রাখাল মিত্রেইকে আগুনের ধারে বসে থাকতে দেখে অবাক লাগল। আগুনের ধারে বসে সে যেন একেবারে অন্ধকারে গাঁথা হয়ে গেছে।

—দাদু, এখানে বসে কী করছ?

—সকালে নেকড়েয় ভেড়াটাকে মেরে ফেলেছে। এখন চামড়াটা ছাড়াতে হবে। এই দেখ, নখগুলো কত গভীর হয়ে আঁচড়েছে। তাড়াতেই পারি না।

ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচ আর আমি দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম।

—কী ছিল, ভালুক?

—না নেকড়ে?

—হেই ভগবান, না, না, নেকড়ে আর ভালুক এখন আর কোথায় পাবে!

তারপর দাদু সেই কথাটিই বলল, যার অভাব আমরা এতক্ষণ প্রবলভাবে অনুভব করছিলাম: 'বন বিড়াল'।

একটা বাতি যেন জ্বলে উঠল। সেই রাত্রের সব অভিজ্ঞতা মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল।

জালিভাই বন বিড়ালের গন্ধ পেয়েই খরগোসকে ছেড়ে দিয়েছে। বন বিড়ালের সঙ্গে ঝটাপটিতেই ওরকম বিশ্রী আঁচড় লেগেছে। তারপর বন বিড়ালটা ভয়াবহ নখগুলি থাবায় গুটিয়ে নিয়ে আমার সামনে দিয়ে নিঃশব্দে অদৃশ্যে পালিয়ে গেছে, একমাত্র বিড়ালের পক্ষেই ওভাবে পালান সম্ভব।

ভাসিলি আলেক্সেয়েভিচও চিনতে পারেনি, তার কারণ চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঝোপের আড়ালে বন বিড়ালটা লুকিয়ে ছিল। এ অঞ্চলে বন বিড়ালের আবির্ভাব বড়ই অপ্রত্যাশিত, তাই সে রকম কোনও সম্ভাবনার কথা আমাদের মনেই আসেনি।

কবরের উপরে দাঁড়িয়ে তাদের ইতিহাসে মগ্ন হয়ে অতীতের দিকে ফিরে গিয়েছিলাম, বর্তমানের কথা আর মনে ছিল না। 'বন বিড়াল' এই ছোট্ট কথাটা যদি মনে থাকত, তবে চারপাশের সবকিছুকে অন্য চোখে দেখতাম। তবে আর খরগোসের কেঁপে ওঠা, লাফান ছায়া না খুঁজে, লুকিয়ে আসা শিকারী বিড়ালের চকিতে ভেসে যাওয়া ছায়ার সন্ধান করতাম।

তবে ঐ ছোট্ট কথাটা অতি সহজেই একটা লোমে ভরা, তামাটে চামড়া মাত্রে পরিণত হতে পারত।

ও, আউলেই, আউলেই, আউলেই!

এপ্রিলের মাঝামাঝি জমাট বরফের রং লালচে হয়ে এল, হ্রদের তীর থেকে বরফ সরে গেল, হ্রদের একেবারে মাঝখানে কিছুটা জলও দেখা দিল। বরফের বাঁধন খুলে ফেলে, হ্রদের জল বিরাট স্ফটিক পাথরের মত ঝলমল করে উঠল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় — দিনের যে কোনও সময়েই তাকাও না কেন — সেই জলে যাযাবর হাঁসেদের ঝাঁক চোখে পড়বে। হয় সাঁতার কাটছে, নয়ত উড়ে এসে জলের উপর বসছে, কিম্বা জল থেকে আকাশে উঠছে। আর সারারাত হাঁসেদের কর্কশ চীৎকার।

হ্রদের তীর থেকে আমি আমার জোরাল দূরবীণ দিয়ে ওদের ভাল করে দেখতে পাই। সবই পোচার্ড বা বুনো হাঁস: সোনালী চোখ, গায়ে সাদা কালো ছিট আউলেই-হাঁসের দল উত্তরের সমুদ্রে চলেছে। রাত্তিরেও শুধু ডাক শুনে আউলেই-হাঁস আমি চিনতে পারি: অন্য হাঁসের কর্কশ চীৎকার বা শিসের চেয়ে তা একেবারেই আলাদা। দূর থেকে, বহুদূর থেকে মনে হয় যেন 'আউলেই' নামের কাউকে ডেকে বেড়াচ্ছে।

—ও, আউলেই, আউলেই, আউলেই,—এই সুরেলা স্বরে ওরা ডেকেই চলবে।

টীল, অল্পজলের হাঁস, প্যাঁক পেঁকে হাঁস এই হ্রদে আসে না। হ্রদের মাঝখানে গভীর জল, কাজেই এখানে ওরা কোনও খাবার পায় না। অল্পজলের হাঁস কখনও গভীরে ডুব দেয় না, কেবল বুকটা ডুবিয়ে রাখে। অথচ বুনো হাঁসরা বরফের তল থেকেও খাবার সংগ্রহ করতে পারে।

কয়েকদিন ধরে রাজহাঁসের দল হ্রদ পার হয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের উল্লসিত জোরাল গলা বসন্তের অন্য সব শব্দ, গান আর ডাক ছাপিয়ে উঠেছে। রাজহাঁসের ডাকের আকুল করা সৌন্দর্য যেমন অসাধারণ, তেমনি অবর্ণনীয়।

বই এর লেখা অনুসারে, রাজহাঁসের ডাকের সঙ্গে রূপোলি শিঙার আওয়াজ তুলনীয়। রূপোলি শিঙা কখনও শুনিনি, তবে রাজহাঁসের ঠোঁট সত্যিই রূপকথার দেশের বিরাট, বিচিত্র শিঙা—অবশ্য সে শিঙাও যে শুনেছি তা বলতে পারি না।

তিন দিন আগে রাত্রে এই বিজয়শঙ্খ আমার স্বপ্ন ভেঙে ডেকে উঠল। মনে হল যেন একেবারে আমার কুঁড়েঘরের মাথার উপরেই ডাকছে।

জামাকাপড় পরেই সেদিন ঘুমিয়েছিলাম, ডাক শুনেই দূরবীণ নিয়ে তীরের দিকে ছুটলাম।

বারটা অপূর্ব সুন্দর হাঁস, বিরাট ছড়ানো ডানায় ভর করে, হ্রদের অপর তীরের আকাশে বাঁকা হয়ে উড়ছিল। অন্ধকার বনের মাথায় ঠিক তখনই সূর্য উঠেছে, তার দীপ্তিতে হাঁসগুলোর সাদা গা আর ডানা রূপোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

এই কারণেই লোকে রূপোলি শিঙার সঙ্গে ওদের তুলনা করে।

হাঁসের ঝাঁকটা মনে হল পাক খেয়ে খেয়ে হ্রদের বুকেই নামছে।

ঠিক সেই সময়েই অন্ধকার বনের গায়ে একটা অমঙ্গলের আলো ঝলকে উঠল, অল্প সাদা ধোঁয়ার মেঘ দেখা গেল অপর তীরে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি দূরবীণটা ওদিকে ফেরালাম, তখন গুলির শব্দটা পৌঁছল, একজন শিকারীর ছোট্ট শরীরটাও দেখতে পেলাম।

সত্যিই শিকারী রাজহাঁসেদের দিকে গুলি করেছে, তার হাতের লক্ষ্যও নিখুঁৎ—রাজহাঁসগুলো ঝাঁক ভেঙে আরও উপরে উঠে গেল। একটা হাঁস পিছনে পড়ে রইল, একটা মাত্র ডানা ঝাপটে সেটা পাশাপাশি উড়ে পাক খেয়ে হ্রদের মাঝখানে পড়ল।

'তুমি আর ওটা পাচ্ছ না!'—মনে মনেই শিকারীর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে গিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রাজহাঁস মারা আইন করে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। অমন সুন্দর পাখি মারার জন্য মোটা অর্থদণ্ড দিতে হয়। রাজহাঁসরা নিভৃতে বসবাস করতে পারে এমন ফাঁকা জংলা জায়গা পৃথিবীতে বেশি আর নেই। এই বিরাট আকারের পাখিরা জলের ঘাস আর নিজের বুকের পালক ছিঁড়ে বাসা বানিয়ে ডিমে তা দিয়ে গোলাপী রঙের পা, নরম পালকে ঢাকা বাচ্চাদের ফুটিয়ে তুলতে পারে এমন বড় হ্রদের সংখ্যা খুবই কম। এমনকি আমাদের বিরাট দেশেও রাজহাঁস কদাচিৎ আসে।

আহত রাজহাঁসটা জলের উপর বসল, জখম হওয়া ডানাটা জলের উপর ছড়ান, গলা খাড়া উপরে তোলা। এই হচ্ছে ডাকিয়ে পাখি, সবচেয়ে বড় রাজহাঁস: ওর খাড়া শরীর আর বন্য ভঙ্গী দেখে সহজেই চেনা যায়।

পৃথিবীর সর্বত্র নগর উদ্যানের গর্বের বস্তু অত্যন্ত সুন্দর মূক রাজহাঁসের সঙ্গে এই জাতের রাজহাঁসের ঐখানেই তফাৎ। জলের উপর মূক রাজহাঁস তার ডানাদুটি পিঠের উপর খাড়া করে রাখে, তার গলা সব সময়েই লাবণ্যভরে লতিয়ে থাকে। ডাকিয়ে রাজহাঁস তার মাথা উদ্ধত ভঙ্গীতে খাড়া তুলে রাখে, ঘাড় সোজা থাকে, আর ডানাজোড়া গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে।

হাঁসটার অন্য সঙ্গীদের খোঁজ করে দেখলাম সবাই হ্রদের একেবারে অন্য ধারে চলে গেছে। আবার তারা ঝাঁক বেঁধে নক্সা গড়ে তুলেছে। ভারী ডানা মন্থর ভঙ্গীতে তালে তালে ফেলে আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, বিপদের জায়গা থেকে কোনও তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

একা পড়ে যাওয়া হাঁসটা তখন আর্তনাদ করে উঠল।

—ক্রিং-ক্রু্য-উ।—একটু ধরা, ভরাট সুরেলা গলায় ডেকে উঠল। বিষণ্ণ ডাক, সে ডাকে ব্যথার সঙ্গে হতাশা মিশে আছে। সত্যিই, সে ডাক হতাশায় ভরা।

— ক্রিং-ক্লিং-ক্লাং-ক্রু্য-উ।—উত্তর এল।

— ক্রিং-ক্রু্য-উ।—আহত পাখি আবার ডেকে উঠল মরিয়া হয়ে।

পাখির ঝাঁকটা ফিরে এল। তীরের ফলার আকারের সেই শোভাযাত্রা বিরাট একটা

পাক খেয়ে একটার পর আরেকটা এইভাবে সার বেঁধে, পাখার স্পন্দন থামিয়ে দিয়ে হাওয়ায় ভেসে এসে জলের উপর পড়ল। আহত পাখিটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

দূরবীণ দিয়ে দেখলাম, একটার পর একটা পাখি জলে নামল, প্রত্যেকে জল কেটে যাবার সময় দুটো ফোয়ারায় জল ছিটিয়ে গেল। তারপর পুরো ঝাঁকটা একসঙ্গে মিশে গেল, তখন আর আহত পাখিটাকে আলাদা করে চেনার উপায় রইল না।

এর পরে কী ঘটল তা নিয়ে আলোচনা করার আমার ইচ্ছে নেই। বলার দরকারও নেই। রাজহাঁসও অল্পজলের হাঁসের মত গভীর জলে খাবার সংগ্রহ করতে পারে না কারণ পাতিহাঁসের মত রাজহাঁসরাও লম্বা গলা বাড়িয়ে অল্পজলের তল থেকে খাবার জোগাড় করে।

দুঘণ্টা পরে রাজহাঁসের ঝাঁকটা মন্থর চালে জল থেকে উঠে তীরের ফলার আকারে শোভাযাত্রা করে উত্তরের দিকে তাদের যাত্রা সুরু করল, সেখানেই তাদের বাসা।

আহত পাখিটা আর্তনাদ করেই চলল। যে যাই বলুক, ওকে যে না খেতে পেয়ে মরতেই হবে, একথা ও বুঝতে পেরেছিল, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এরকম উপকথা চলিত আছে যে রাজহাঁস মৃত্যুর আগে গান গেয়ে ওঠে। সত্যিই এই সুরেলা ডাক গানেরই মত, কোন্ এক অদ্ভুত শিঙার সুর।

হাঁসটাকে বাঁচাবার অসম্ভব চেষ্টা আমি করেছিলাম। জেলেদের সাহায্য চাইতে তারা শুধু মাথা নাড়ল। শুধু যে বরফমুক্ত জলে নৌকো নিয়ে যাওয়াই অসম্ভব তা নয়, পায়ের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়াও বিপজ্জনক ব্যাপার। হাঁসটা জমে না যাওয়া জলের মাঝখানেই আটকে রইল। সে জল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। হাঁসটা কিছুতেই বরফ বাঁধান তীরের দিকে এল না। তার ডাক আমায় এমন বিচলিত করে তুলল যে আমি আমার ঘর ছেড়ে হ্রদের উঁচু পাড়ে চলে গেলাম। কিন্তু তবুও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার গভীর দুঃখে ভরা আকুল ডাক আমায় তাড়া করে বেড়াল।

দুদিন পর সকালবেলা ফিরে এলাম।

রাজহাঁসটা চুপ, জলের বুকে ওকে দেখাও যাচ্ছে না।

দূরবীণ দিয়ে দেখলাম, বরফের ধারে একটা বড় লাল ছোপ, আর বরফের উপর শেয়ালের ক্ষীণ পায়ের ছাপ; বন থেকে হ্রদের বরফ মাড়িয়ে এগিয়ে গেছে না জমা জলের ধার পর্যন্ত সেই ছাপ।

হয়ত রাত্তিরে রাজহাঁসটা তীরের অল্পজলে যাবার জন্য জল ছেড়ে জমা বরফের উপরে ওঠা মাত্র তাকে শেয়ালে ধরেছে। কিন্তু সত্যিই কী ঘটেছে তা বলা বড় কঠিন।

মোট কথা, রাজহাঁসটা আর নেই। রয়েছে কেবল না জমা জলের বুক থেকে আউলেই-হাঁসের সুরেলা ডাক:

—ও, আউলেই, আউলেই, আউলেই।

হাঁসগুলো হ্রদ ছেড়ে উত্তরে তাদের বাসায় উড়ে চলে যাচ্ছে।

শুনে খুসি হলাম, যে লোকটা রাজহাঁস মেরেছিল বনরক্ষক তাকে ধরে আদালতে চালান করে দিয়েছেন।

নিঃশব্দের
কথা

উম্‌ম্‌ম্‌ !

আমার যখন ছ বছর বয়স তখন প্রথম শুনি।

সমুদ্র তীরে একেবারে একা খেলে বেড়াচ্ছি, কাছেই আমাদের কুঁড়েঘরের জানলা থেকে মা নজর রাখছেন।

আমি বালি দিয়ে দুর্গ বানাচ্ছিলাম, আর তার তলে সুড়ঙ্গ। এই চিত্তাকর্ষক কাজে একেবারে মগ্ন হয়ে গেছি, কিন্তু তবু চারিদিক যে হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেছে তা লক্ষ্য না করে পারিনি।

তখন বোধ হয় ঠিক দুপুর হবে। চারিদিকের ঐ স্তব্ধতা যখন অনুভব করলাম সূর্য তখন প্রায় সোজা মাথার উপরে। সবকিছু, সমস্ত পৃথিবী মনে হল হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। নিস্তব্ধতা মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত উঠে চারিদিক ভরে দিয়ে স্পর্শগ্রাহ্য জমাট বাঁধা পাহাড়ের মত দাঁড়িয়েছে। কেমন করে এমন হল? একেবারে মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেল, নাকি যখন খেলছিলাম তখন আমার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে এই নিস্তব্ধতা নেমে এল? আমাদের বাগানে কিছুই নড়ছে না, পাখিরা চুপ হয়ে গেছে, লুকিয়ে পড়েছে। ঝোপঝাড় গাছের ছোট হয়ে আসা নীল কালো ছায়া পথের উপর পড়ে আছে, একটুও নড়ছে না, এমন কি হাওয়াও যেন দমবন্ধ করে বসে আছে। চারিদিকে কত প্রাণী ছিল: পাখি, ফুল, গাছ। আমি জানতাম আমার চারপাশে এই বিরাট, বিচিত্র প্রাণ তখনও রয়েছে, কিন্তু সবই যেন হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, যেন অপেক্ষা করে রয়েছে—যেই কেউ একটা যাদুমন্ত্র পড়বে অমনি নিমেষের মধ্যে এই কল্পনাতীত অজানা স্তব্ধতা ভেঙ্গে যাবে।

আজ মনে পড়ছে আমার যখন ছ বছর বয়স তখন আমার মনে নিস্তব্ধতার এই রকম ছাপই পড়েছিল। এমন হঠাৎ চুপ করে যাওয়াটা রহস্যে ভরা মনে হয়েছিল; ব্যাপারটা

কী বুঝতে পারিনি, তাই আমিও চুপ করে সতর্ক দৃষ্টিতে অপেক্ষা করে রইলাম — মুহূর্তের মধ্যে ভর দুপুরের স্তব্ধতা আর আমার মাথার উপরের এই গুমোটের ভিতর কিছু একটা ঘটবে, সঙ্গে সঙ্গেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। পাহাড় খুলে ভিতরের রত্নভাণ্ডার প্রকাশ করার জন্য কেবল 'আরব্যোপন্যাসের' 'আলিবাবার' চিচিংফাঁকের প্রয়োজন।

অপেক্ষা করে রইলাম। যে বালির দুর্গ বানিয়েছিলাম, তা নিঃশব্দে ভেঙে গিয়ে আমার পায়ের কাছে পড়ল।

চমকে উঠে বাড়ির দিকে তাকালাম।

মা জানলার কাছে নেই, লাফ মেরে দৌড়ে মার কাছে চলে যাবার সাহসও আমার হল না।

চারিদিক যেমন নীরব ছিল, তেমনিই রইল। কেবল সংকীর্ণ উপসাগরের ছোট ছোট ঢেউগুলো তালে তালে তীরে ভেঙে পড়ে বালি ভিজিয়ে দিতে লাগল, সেই ঢেউয়ের শিস্ প্রায় শোনাই যায় না। সমুদ্র শান্ত।

আমিও তাই। দমবন্ধ করে ফেলেছি। কেবল হৃৎপিণ্ডটা খুব দ্রুত ধুক্‌ধুক করে চলেছে।

কতক্ষণ যে এরকম চলল তা বলতে পারব না।

এখন বেশ ভাল করেই বুঝতে পারি এই নিস্তব্ধতা ব্যাপারটা আসলে কী। গ্রীষ্মের দুপুরের গুমোটের ফলে এর জন্ম। গরমে ক্লান্ত হয়ে পাখিরা চুপ করে যায়; শিকারী পাখিরা ভোর থেকে মেলে দেওয়া ডানায় ভর করে আকাশে উড়ে বেড়িয়ে তখন ছায়ায় লুকিয়ে পড়ে; মাছরা তখন আর কাঁচের মত উজ্জ্বল নদী বা পুকুরে খেলা করে না, চলে যায় দূরে জলের অতলের গাছপালার ছায়ায়, এমনকি শাফ্‌লারাও তাদের সবুজ হলদে আর সাদা মাথা জলের তলে ডুবিয়ে নেয়। গ্রীষ্মের সূর্য যখন মাথার উপরে, কোথাও একটুও হাওয়া নেই, ভীষণ গুমোট — তখন এই রকমই হয়। যত বেশি গরম পড়বে, প্রকৃতির উপর নিস্তব্ধতার এই রাজত্ব ততই বিস্ময়কর হয়ে উঠবে। কেবল মাঠঘাট, বন আর সমুদ্রেই এই নিস্তব্ধতা অনুভব করা যায়। সহরে বোঝা যায় না। দুপুরের পর হয়ত এক ঘণ্টা কি তারও কম পার হয়ে যেতেই দেখা যায় যেমন করে নিস্তব্ধতা এসেছিল, ঠিক তেমনি করেই শব্দও আবার ফিরে এসেছে।

... কিছুই আসলে ঘটেনি, কিন্তু তবুও অনুভব করেছিলাম, সেই নিস্তব্ধতা আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। সেই অদ্ভুত মন্ত্র ক্রমশ কেটে যাচ্ছে।

ঠিক সেই সময়েই পরিষ্কার শুনতে পেলাম :

—উম্‌ম্‌ম্‌!... —সমুদ্রের কোন দূরে সেই শব্দ জেগে উঠেছিল, শান্ত জল তাকে তীরের কাছে বয়ে আনল। আমাদের বাড়ির পিছনের বনে সেই শব্দ বাধা পেয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল :

—... বব!

তীর থেকে দূরের বালির চড়ায়—শব্দটা নিশ্চয়ই সেখান থেকেই এসেছে—গাংচিলরা উত্তেজিত হয়ে উঠে, চেঁচাতে চেঁচাতে আকাশে উঠে গেল। হাওয়া উঠল। বাগানে ফিঞ্চ পাখির গান আর গঙ্গাফড়িং-এর কিচিরমিচিরের প্রতিধ্বনি উঠল। নিস্তব্ধতার সেই জমাট বাঁধা পাহাড় ভেঙে পড়ল।

লাফিয়ে উঠে সমুদ্রের দিকে বার বার দেখলাম : শব্দটা কে করল?

কিন্তু কাঁচের মত জলের বুকের শান্তি কেউ ভাঙল না।

অবাক লাগল : এমন একটা বিরাট কথা, সারা জগৎ যা শুনতে পায়, কে যে বলল তাকে দেখতে পাওয়া গেল না! সমুদ্র কি তাকে তার ভিতরে টেনে নিল?

সেই বয়সে পৃথিবীর সবকিছুই সজীব আর সবাক বলে মনে হয়, সমস্ত জগৎ তখন একটা রূপকথা, তবে সাগরই বা কেন কথা বলবে না? রূপকথায় সমুদ্রের রাজা কি কথা বলেন না?

এরকম কথা সমুদ্রের অতল গভীরতা থেকেই বুদ্‌বুদের মত জেগে উঠে সমস্ত জগতকে তার ডাক শোনাতে পারে।

দৌড়ে মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'উম্‌ম্‌ম্‌' মানে কি, আর কেই বা বলল কথাটা।

মা কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। রান্নাঘরে ছিলেন, তাই কথাটা শুনতে পাননি, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকায়, আমি যে তাঁর কাছে কী চাই তা বুঝতেও পারলেন না।

অমন একটা কথা কখনই ভোলা যায় না, বাড়ির বড়দের সবাইকে অনেক দিন পর্যন্ত এবিষয়ে নানা প্রশ্ন করেছি। কিন্তু কেউ কোনও উত্তর দিতে পারেনি, এমনকি 'সমুদ্রের বুড়ো নেকড়ে বাঘ' যে খালাসীরা, যারা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে, তারাও না।

কিন্তু তার বদলে তারা সমুদ্রের এমন সব আশ্চর্য ঘটনা বলত, তা শুনে আমি সব ভুলে যেতাম, এমনকি আমি যাকে বলতাম 'অতলজলের কথা', তার রহস্যও।

খালাসীদের মতে সমুদ্রে দেখা যায় না, ঘটতে পারে না এমন কিছুই নেই। বিচিত্র জিনিস সব সমুদ্রে ঘটে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সমুদ্রে এমন সাপ আছে যা যোজনব্যাপী লম্বা; এমন মাছ আছে যা উড়তে পারে (বক্তা নিজের চোখে দেখেছে); সমুদ্রের ভিতর এমন সব রাক্ষসের মত বিরাট বিরাট জন্তু আছে যা মাস্তুল টাস্তুল শুদ্ধ একটা গোটা জাহাজ গিলে ফেলতে পারে। এইটুকুই সব নয়: একজাতের মাছ আছে জাহাজের রাঁধুনে যখন তাদের পেট ছুরি দিয়ে কাটত তখন তারা মোরগের মত ডাকত। 'সত্যি না হলে লোকে যেন আমার মরা মুখ দেখে,—বুড়ো খালাসী কসম খেয়ে তার গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সব সন্দেহ দূর করতে চাইল,—আমি নিজের কানে শুনেছি, যদি মিথ্যে হয়, তবে আমায় ডুবিয়ে মের।'

তারপর বড় হলাম। এমন বয়সে পেঁাছলাম যখন লোকে এই সুন্দর, রহস্যে ভরা, মোহিনী পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতি সজাগ থাকে, কিন্তু তার বিষয়ে কোনও কথাই আর যাচাই না করে মেনে নেয় না। ছেলেবেলায় খালাসীর গল্পে মগ্ন হয়ে যেতাম, ওদের কাছে সমুদ্রের যে সব অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনতাম তা সম্পূর্ণ সম্ভব বলে মনে হত। পরে যখন গল্পগুলোকে আবার যাচাই করি তখনই সন্দেহ আসে। তখন ভাবি এর কতটা সত্যি আর কতটা বানান, আর বানান গল্পের মধ্যেও বা কতটা সত্যি লুকিয়ে আছে।

বোধ হয় আমার মনটাই ঐভাবে তৈরী, কারণ এই বুড়ো বয়সেও আমি জীবনটাকে একটা দীর্ঘ রূপকথা বলে মনে করি। কী শুনছ তাতে কিছু এসে যায় না, হোক না তা অতি সাধারণ, একঘেয়ে, তবুও দেখবে তারই খোলার ভিতর লুকনো রয়েছে অত্যাশ্চর্য জিনিস। কাছ থেকে ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে তা অজানায় ভরা, অন্ধকার বনের ভিতর লুকিয়ে রয়েছে কত ছোট বড় রহস্য।

আরেকটা ব্যাপারও আমার বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে, বড়দেরও নানারকম গল্প বানানয় কী উৎসাহ, অথচ বাস্তব জীবনটা মানুষের বানান গল্পের চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক, কত বেশি বৈচিত্র্য ও বিস্ময়ে ভরা।

বড়রা জাহাজ গিলতে পারে এমন রাক্ষুসে জন্তুর গল্প বলে। কিন্তু সমুদ্রের সত্যিকার বিস্ময় হল তিমি মাছ, তার ওজন বেশ কয়েক শ' মন হলেও গলার ফাঁকটা এতই সংকীর্ণ যে একটা ছোটখাট মানুষও গিলতে পারে না। কিন্তু তিমি মাছ তাদের কোনও ঔৎসুক্য বা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না।

বিজ্ঞানের বই যখন পড়তে সুরু করলাম তখন এমন সব অত্যাশ্চর্য গোপন কথার সন্ধান পেলাম যা ওদের ঐ রূপকথার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময়কর। বইয়ে এমন সব মাছের কথা পড়লাম তারা সত্যিই আকাশে ওড়ে, মাটিতে হাঁটে, এমনকি গাছেও চড়ে। আর সত্যিই সমুদ্রের মোরগ নামে একরকম মাছ আছে, তারা ভীষণ চ্যাঁচায়।

এসব পড়েশুনে সেই যে 'অতলজলের কথা' শুনেছিলাম তার কথা আবার মনে পড়ল, ভাবলাম হয়ত সেটা কোনও মাছের ডাক হতে পারে। রহস্যটা সমাধান করার ইচ্ছে হল।

মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন বিশ্বের সবকিছুরই ব্যাখ্যা চায়, এমনকি তার নিজের সবকিছুরও। তা না হলে সে বাঁচবে কী করে? মানুষকে সবকিছু জানতেই হবে, বুঝতেই হবে, নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে—যা চলছে চলুক আমার তাতে কী—গোছের ভাব করলে চলবে না।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের উপসাগরের তীরে তখনও আমরা গ্রীষ্মকালে যেতাম। আর সেই শব্দ অনবরত শুনতাম।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও, কে বা কী যে সেই শব্দ করত, তা বের করতে পারিনি। পরিবেশটা সব সময়েই একই রকম ছিল: কাঁচের মত শান্ত সমুদ্র, গাংচিল ছাড়া তার বুকে আর কিছুই নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিশ্চল—এমন সময় এল সেই শব্দ 'উম্‌ম্‌ম্।'

প্রমাণ হল এই 'উম্‌ম্‌ম্' শুধু দুপুরবেলাতেই যে হয় তা মোটেই নয়। সকালে, দুপুরে আর সন্ধ্যাবেলায়ও শুনেছি, যতক্ষণ সমুদ্রটা শান্ত থাকত ততক্ষণ।

কিন্তু এই রহস্যজনক শব্দ কে বা কী করত?...

দশটি বছর এই প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরল।

উত্তরটা পেলাম একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আর অদ্ভুত অবস্থায়।

হল কি, একদিন একটা জলে ডোবা মড়া দেহ তীরে ভেসে এল। কাছের গ্রাম থেকে একজন 'উরিয়াদ্‌নিক্', গ্রামের পুলিশদের তখন ঐ নামেই ডাকা হত (ব্যাপারটা বিপ্লবের আগে ঘটেছিল), আর করোনারকে ডেকে আনতে লোক গেল, ইতিমধ্যে দেহ-টাকে পাহারা দেবার জন্য একজন লোক বসিয়ে রাখা হল।

রাত্তিরে স্পিরকার উপর পাহারার ভার পড়েছিল। স্পিরকাকে আমি চিনতাম। স্পিরকা যে ঠিক দুর্বলচিত্ত তা নয়, তবে তেমন মনের জোরও ওর নেই। ওর মত লোককে

সারা জীবন সবাই বানান নামেই ডাকে। ও যাই করে তাই ভুল হয়ে যায়। নানারকমের সব অদ্ভুত ধারণা ওর আছে। আর বলতে গেলে ও কোনও কাজই করে না। অধিকাংশ সময়েই দেখা যেত পাঁচ মাইল বা ওই রকমই দূরের গির্জায় সে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে, গির্জায় প্রণাম করে অমঙ্গল দূর করবে। অমঙ্গলের ভয় স্পিরকার ভীষণ ছিল, সবখানেই ও অপদেবতার উপস্থিতি অনুভব করত। আর এখন ওকে সারা রাত একটা মড়ার পাশে বসে কাটাতে হবে—ভয়ে ও মরেই যাবে, কিন্তু গ্রামের মোড়লের কথা ঠেলবার সাহসও ওর নেই।

স্পিরকা তাই আমার কাছে এসে সাহায্য চাইল।

—লক্ষ্মী বাবা আমার, রাত্তিরটা আজ আমার সঙ্গে বসে কাটা। ভয়ে আমার প্রাণ বেরবার জোগাড়।

ষোল বছর বয়সের বাহাদুরীর ফলে আমি যে ভয় পেয়েছি সে কথা কী করে স্বীকার করি। আমি আবার অন্যের এতটুকু ভয় দেখলে নির্মমভাবে ঠাট্টা করে থাকি।

স্পিরকার 'ভূতপ্রেতকে' আমি এত ঠাট্টা করি দেখে ও স্বভাবতই মনে করেছে যে আমার কিছুতেই ভয় নেই।

কিন্তু সত্যি বলতে কি, এর আগে আমি কখনও মরা মানুষ দেখিনি, ঐ মড়াটার পাশে সারা রাত্তির বসে থাকাটা আমার মোটেই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হল না।

—ঠিক আছে,—আমি বললাম—এক মিনিট দাঁড়াও, আমি দুয়েকটা জিনিস নিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে রাত্তিরটা কাটাব, কিন্তু যেই আলো হবে অমনি আমি চলে যাব। আমায় মাপ করতেই হবে—শিকারে যাব, বুঝেছ!

সারারাত না ঘুমিয়ে তারপর শিকার যা হবে তা ত জানিই, কিন্তু বন্দুকটা সঙ্গে নেবার একটা কৈফিয়ৎ ত দিতে হবে!

স্পিরকা তাতেই খুসি, অন্ধকারের সময়টা ত কেউ থাকবে পাশে!

রাত্তিরে ত দুজনে আগুনের ধারে বসে গল্প করে চললাম। প্রাণপণে সব মজার মজার কথা, মজার মজার ঘটনার কথা মনে করতে চেষ্টা করলাম, বলা বাহুল্য মরা মানুষ বা জলে ডোবা মড়া এই জাতের আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ হল।

কিন্তু তবুও 'সে' আমাদের আগুনের চমকের সীমানার মধ্যেই শুয়ে আছে। আমরা একেবারে বনের ধারে বসেছিলাম, 'সে' শুয়ে আছে আমাদের আর সমুদ্রের মাঝখানের

বালিতে; একটা মাদুর জাতীয় জিনিসের তলে। ঐ 'সে' শুয়ে আছে, নিস্তব্ধ, নির্বাক, নিশ্চল। এর চেয়ে শান্ত আর কী হতে পারে? কিন্তু তবুও স্পিরকা ভয় পেয়েছে, আমিও। দুজনেই 'ওর' দিকে অর্ধেক পিছন ফিরে বসেছি—পুরো পিছন ফিরতেও ভয়। প্রতি মুহূর্তে এক চোখের কোণ দিয়ে একবার করে 'ওর' দিকে তাকাই।

একথা অবশ্য আমি জানতাম যে মৃত্যুর সঙ্গেই সবকিছুই ফুরিয়ে যায়; জানতাম যে মরা মানুষ কখনও উঠে দাঁড়ায় না, কোনও ক্ষতিও করতে পারে না। কিন্তু সে বিষয়ে কি একেবারে নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম? যদি ভয়ংকর একটা কিছু ঘটে যায়, তখন? অবশ্য কী যে ঘটতে পারে তা কল্পনা করতে পারলাম না।

আগুনের উপরে চা বানাবার জন্য একটা পাত্র ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। আমার দোনলা বন্দুকটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

রাত্তিরটা চমৎকার চুপচাপ, জুন মাসের রাত্তির যেমন হয়। কেবল ঢেউগুলো শান্তভাবে তীরে এসে পড়ছে; আকাশে ম্লান তারার দল শান্ত দীপ্তিতে জ্বলছে।

মোরগ দ্বিতীয়বার ডেকে ওঠার পর হঠাৎ শুনি পায়ের শব্দ। সমুদ্র তীর থেকে কেউ আমাদের দিকেই হেঁটে আসছে। তার পায়ের নিচে পাথর মাড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

স্পিরকার দিকে তাকালাম—চোখদুটো তার প্লেটের সমান গোল হয়ে গেছে, মুখটা বিরাট হাঁ—ভয়ের মূর্তছবি।

বন্দুকটাকে হাঁটুর উপর তুলে নিয়ে, কে আসে তার অপেক্ষায় রইলাম।

একটি বেঁটেখাট বুড়ো, মোটেই ভয়াবহ চেহারা নয়, এল। গোছা গোছা দাড়ি, হাতে একটা গাঁঠওয়ালা লাঠি, কাঁধে বোঁচকা, পায়ে লম্বা বুট। এক কথায়, সহরের এক বুড়ো এ পথ দিয়েই চলেছে।

আমাদের দেখে সে এদিকে ফিরেছে।

—তোমরা শান্তিতে থাক,—সে বলল—বন্ধুরা যে ঘুমওনি?

—ঐখানের ঐটাকে পাহারা দিচ্ছি,—মাথা নেড়ে মাদুরটা দেখিয়ে দিয়ে উত্তর দিলাম।

—ও তাই!

বুড়ো 'ঐখানে ঐটার' কাছে এগিয়ে গেল, লাঠিতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল, মাদুরটা সরিয়ে তার তলের মুখটাকে অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে দেখল। তারপরে আবার সযত্নে সেটাকে ঢেকে রাখল।

—ঐটে কিসের জন্য?—হাঁটুর উপর রাখা আমার দোনলা বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করল।—তোমার ধারণা 'ও' দৌড়ে পালাবে?

কী বলব ভেবে পেলাম না। বন্দুকটাকে আবার গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখলাম।

বুড়ো কাঁধ থেকে বোঁচকাটা নামিয়ে বসল, তারপর একটা চিলতে ওঠা এনামেলের কাপ আর কিছু পাঁউরুটি বের করে গরম জল চাইল।

স্পিরকা পাত্র থেকে কিছু জল ঢেলে দিল।

বুড়ো নিঃশব্দে তার চা খেল, তার রুটি খেল, তার কাপটা আগের জায়গায় রেখে দিল, তামাকের থলে আর সিগারেট পাকাবার জন্য চৌকো করে কাটা কিছু খবরের কাগজ বের করল, তারপর চুপ করে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল।

আমিও নিজের ভাবনায় কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম। বুড়োটিকে দেখে আমার মোটেই ভাল লাগেনি। 'ঐখানের ঐটার' মুখ অমন নির্লিপ্তভাবে যাচাই করে দেখার জন্যই কি? নাকি বন্দুক নিয়ে আমায় ঠাট্টা করল বলে?

—...এস, সিগারেট খাওয়া যাক!—বুড়ো বলল।—কিছুটা তামাক পাতা নেওয়া যাক, বনের ছায়ামূর্তি এই বুড়োকে মনে রেখ।

'বনের ছায়ামূর্তি' অপদেবতার উল্লেখটাই কেবল বাকি ছিল। দেখলাম স্পিরকা চমকে উঠে শার্টের ভিতরে হাত পুরে, বুকের কাছে হাত নিয়ে ভগবানের নাম জপছে।

বুড়ো তা লক্ষ্য করল বলে মনে হল না। সে ধূমপান করেই চলল, আমাদের দিকেও কিছু তামাক বাড়িয়ে দিল, আমরা না নিতে, সে বকর বকর সুরু করল।

সেই মুহূর্তে স্পিরকা আর আমি যে বিষয়ে কোনও কথা শুনতে চাই না সেই মড়ার কথাই সে সুরু করল।

বুড়ো বলল গত চল্লিশ বছর ধরে সে মর্গ্, তার ভাষায় 'মৃত পুরী' পাহারার কাজ করে আসছে। মড়ার বিষয়ে ও বিশেষজ্ঞ, বোঝা গেল সে সম্বন্ধে সে সব খবর দিতে পারে। ওর গল্পে তখন আমার বেশ কৌতূহল সুরু হয়েছে, এমন সময় স্পিরকার দিকে চোখ পড়াতে আমি বিশেষ জোর দিয়ে বুড়োকে ওবিষয়ে কথা বলতে বারণ করলাম।

বুড়োর পেয়ারের বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করে দেওয়ায় বুড়ো নিজের মনে রাগে গজগজ করতে করতে চুপ করে গেল।

বন পেরিয়ে মোরগের তৃতীয় ডাক ভেসে এল। সকাল হবার আগের স্তব্ধ সময়। সমুদ্র আর বন নীরব হয়ে গেছে: সকালের মন্দ বাতাস তখনও বইতে সুরু করেনি। ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে মাটি আর সমুদ্র থেকে কোনো হাওয়া ওঠেনি। বনের মধ্যে পাখিরা তখনও ঘুমিয়ে।

—...উম্‌ম্‌ম্‌!...—সাগর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল।

—ভগবান, আমায় দয়া কর!—স্পিরকার আকুল প্রার্থনা। ভয়ে ওর প্রায় মরে যাবার জোগাড়, অতি দ্রুত প্রার্থনা করে চলল, কথাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে গেল।—ভগবান, আমাদের সব পাপ ক্ষমা কর। আমাদের রক্ষা কর। তোমার সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হও। হে ভগবান, আমাদের রক্ষা কর।...

বুড়োকেও সেই ভুতুড়ে আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠতে দেখে ভিতরে ভিতরে বেশ আনন্দ উপভোগ করলাম। কিন্তু সে নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে স্পিরকার অস্ফুট প্রার্থনার রেশ শেষ হবার আগেই, তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠল:

—ও তুমি তাহলে আঁৎকে উঠেছো, দেখছি। নিছক অজ্ঞতা ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

তার গলার স্বরে একটা শান্ত নিশ্চিতির সুর ছিল, অজানার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা,— তাই হঠাৎ মনে হল, যে 'অতলজলের কথা' আমায় এত ভুগিয়েছে, এই লোকটি নিশ্চয়ই জানবে তার রহস্য।

সম্মান যাতে খোওয়া না যায় তাই জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে, ছ বছর হাই ইস্কুলে পড়ার নাকতোলা ভাব নিয়ে খুব 'মাজিত শিক্ষিত' গলায় জিজ্ঞেস করলাম:

—এই মাত্র যা শুনলাম তুমি নিশ্চয়ই তার রহস্য খোলসা করে দিতে পার?

বুড়ো থুক্ করে আগুনে থুতু ফেলল।

—আগে কখনও ত শুনিনি। তবে আঁচ করা কঠিন নয়। তথ্যগুলো সবই হাতের কাছেই রয়েছে।

কথা শুনে বেশ প্রত্যয় হল।

হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক বেড়ে গেল: দশ বছর ধরে যে রহস্য আমায় শান্তিতে থাকতে দেয়নি আজ তার সমাধান হবে, সে সমাধানের সন্ধান পাব এই চুনোপুঁটির কাছ থেকে যে তার অর্ধেক জীবন কাটিয়েছে মড়া ঘেঁটে। ব্যাপারটা অপমানজনক, কিন্তু এর উত্তেজনাও প্রবল।

—কী তোমার 'তথ্য', শুনি?—'তথ্য' কথাটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে, যতদূর সম্ভব নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

বুড়ো আমায় খুব ভাল করে দেখে নিয়ে উঠে পড়ল। বেশ রাজকীয় চালে তার ছড়ান হাতটা বুকের সামনে চালিয়ে দিল, মনে হল যেন জায়গাটা মাপছে। তারপর বালির উপরের সেই মাদুরটার নিচে যা ছিল সেটা দেখিয়ে বলল:

—বঝলে ত?

আমি ত হতভম্ব।

—দ্বিতীয় তথ্যটা বেশ পরিষ্কার: ঐ যে ঐটা। কিন্তু প্রথম তথ্যটা—তেমন খোলসা হল না।

—প্রথমটা হল সমুদ্র। সমুদ্রে ত আর একটা মড়াই থাকে না, অজস্র থাকে।

—'ওর' সঙ্গে শব্দটার কী সম্পর্ক?—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—'কী সম্পর্ক' মানে?—বুড়ো রেগে উত্তর দিল।—অনেকে অনিচ্ছায় জলে ডোবে, হয় দুর্ঘটনায়, নয়ত অন্য কেউ জলে ঠেলে ফেলে দেয়। সেই সব লোক ত আর তাদের শেষ কথা বলে যেতে পারে না, তখনও শেষ নিঃশ্বাস জমে থাকে, বুঝতে পারছ? তাই তারা জলের তল থেকে হলেও, পৃথিবীকে তাদের শেষ কথা বলে যেতে চায়। সমুদ্রের তল থেকে সে কথা শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিংড়ে বার হয়।

কী বাজে বকছে, মনে মনে ভাবলাম। আমাদের আবার কুসংস্কার আর অজ্ঞতার জন্য দোষ দিচ্ছিল।

তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে জোর করে একটা লম্বা হাই তুললাম, যেন খুবই একঘেয়ে লাগছে, এমন ভাব।

তাতেই মরলাম।

—দেখ হে, ছোকরা,—বুড়ো হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলে উঠল,—পড়াশুনো করেছ বলেই ত বোধ হচ্ছে। তবে মরা মানুষে এত ভয় পাও কেন? দিদিমা পিসীমাদের গল্পে এখনও বুঝি বিশ্বাস আছে? ছ্যাঃ, লজ্জার কথা।

—আমি ভয় পেয়েছি! কে তোমায় বলল?—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—তা মোটেই নয়, আমি বরং নিজের থেকে এসেছি, ওকে সঙ্গ দিতে,—স্পিরকার দিকে ঘাড় নেড়ে বল্লাম,—ও ভয় পায় কি না!

বুড়ো দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'তা তুমি যখন ভয় পাও না, তখন একবার কষ্ট করে সমুদ্রের দিকে যাও ত দেখি। আর কোনও মড়া ভাসছে কিনা দেখে এস। সত্যিই গেছ কিনা তার প্রমাণ হিসেবে এই খালি পাত্রটা নিয়ে যাও, ওতে সমুদ্রের জল ভরে এন। কী পারবে?...'

একেবারে সম্মুখ সমরে আহ্বান, রাজী না হলে ভীতু প্রমাণ হয়ে যাব।

লাফিয়ে উঠে, পাত্রটা তুলে নিয়ে, বন্দুকের দিকে হাত বাড়াতেই বুড়োর দিকে চোখ পড়ল। তার মুখের বিদ্রূপের ভাব দেখেই হাতটা এক ঝটকায় নামিয়ে নিয়ে, সমুদ্রের দিকে চলে গেলাম।

সোজা সমুদ্রের দিকে যেতে হবে প্রায় শ খানেক ফুট পথ। মাদুরের তলের মড়াটাকে পার হতে হবে, যতদূর সম্ভব মড়াটার কাছ দিয়েই গেলাম।

পিছন ফিরে না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারলাম, বুড়োর চোখদুটো আমায় অনুসরণ করে চলেছে।

বুড়োর উপর ভীষণ রাগ হল, নিজের উপরেও। কারণ সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম, যদিও কিসের ভয় তা জানি না। আমি কখনও গির্জার ইস্কুলে পড়িনি, ডাইনী বা যাদুমন্ত্র, ভূতপ্রেত বা মরা মানুষের কফিন ছেড়ে উঠে আসা এসবে আমার বিশ্বাস নেই। এও বিশ্বাস করি না ডুবে মরা লোক জানলায় টোকা মারে।

... কালো কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে
চিমটি কাটা ফোলা দেহে ...

ছেলেবেলায় মুখস্থ করা পরিচিত লাইনদুটি মনে পড়ে যেতেই সারা শরীর হিম হয়ে গেল।

—ধুত্তেরি।—ও কথা আর ভাবব না, পরে বরং ভয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা যাবে। যাই হোক, দিনের বেলা ত আর আমি ভয় পাই না।

সমুদ্রের কাছে যখন এলাম, তখন ভোর হচ্ছে। জলের দিকে তাকালাম। আর দেখলাম সেখানে—না, হতেই পারে না—এতটা কি আর দৈবাৎ ঘটা সম্ভব।

কিন্তু একটা আশঙ্কা আমার সারা শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে গুঁড়ি মেরে নামতে লাগল: ভুলতে পারলাম না, আমার পিছনেই 'সেইটে' রয়েছে, মাদুর দিয়ে ঢাকা।

...ফুলে ওঠা নীল দেহ...

সেই সঙ্গে এটাও উপলব্ধি করতে হল, যে জীবনে এমন অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দৈবাৎ ঘটে যায়, যা মানুষ আগে থেকে কল্পনাও করতে পারে না।

একটা কালো দেহ ঢেউয়ের উপর ভাসছে।

—সব বাজে, নিশ্চয়ই জলে ডোবা পাথর, ভাঁটার টানে মুহূর্তের জন্য বেরিয়ে পড়েছে।—নিজের চোখের সাক্ষ্যকেই মনে মনে বাধা দিলাম; ওটা এমন কিছু একটা, যা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে চাই না।

কালো দেহটা শান্ত ঢেউয়ের উপর দুলতে দুলতে তীরের এত কাছে এসে পড়ল, যে

তার উপরে হলদে ছটা দেখতে পেলাম, সূর্যের আলোর ছটা। দেহটাকে যে ঢেউ তীরের দিকেই নিয়ে আসছে, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

আর নিজেকে ভুল বোঝান সম্ভব নয়।

অজ্ঞান হয়ে যাবার মত হল, হাঁটুতে জোর পেলাম না, বালির উপর ধপ্ করে বসে পড়লাম।

কালো দেহটা বোধ হয় মিলিয়ে গেল। কিন্তু না, ঐত, এখন আরও কাছে।

... আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। নাকি চোখের ভুল?

চুপ করে বসে রইলাম, নড়বার সাহস হল না।

তারপর, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জলে ডোবা দেহটাকে সমুদ্রের ঢেউ একেবারে আমার পাশেই ভিজে বালির উপর এনে ফেলল। জলে জুবজুবে একটা দেহ, সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল, মাথাটা জলে ভিজে চুলটুল লেপ্টে গিয়ে কেমন চকচকে হয়ে গেছে! আর সেই মাথা থেকে বড় বড় দুটো সজীব চোখ সোজা আমার দিকে তাকিয়ে।

আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না।

লাফিয়ে উঠলাম... ঠিক সেই সময়েই জলে ডোবা দেহটা দুলে উঠে আবার সমুদ্রে চলে গেল, তা না হলে যে আমি কী করতাম তা জানি না।

জানি তোমরা হাসবে, তা হাস, কিন্তু ওটা আসলে যে সীলমাছ তা তখনও বুঝতে পারিনি।

বুঝতে পারলাম আরও পরে, যখন বেশ আলো হয়ে গেছে। তীরের কাছাকাছিই সীলটা সাঁতার কাটছিল, কিছু পরেই একটা চ্যাপ্টা পাথরের উপর উঠে এল, পাথরটা প্রায় পুরোটাই জলের নিচে।

সেই পাথর থেকে সীলমাছটা আবার সমুদ্রে লাফ মারল: আমায় যে দেখতে পেয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই। জলে ডুব মেরে আবার ধড়ফড় করে জলের উপরে উঠে এল, আর তখন অত্যন্ত স্পষ্ট আর পরিষ্কার শুনতে পেলাম সেই কথাটা:

উম্ম্ম্!...

হঠাৎ দৈবাৎ এই তুচ্ছ আবিষ্কারে আমার যে কী ভীষণ আনন্দ হল তা আর কী বলব! বেঁটে বুড়োটা আমায় ঠাট্টা করছিল বলে তাকে এক হাত নিতে পারব, এই কারণে

আনন্দ নয়। এমনই হল, তারপরে সেই বুড়োর আর দেখাই পেলাম না : সে সমুদ্র তীর থেকে আমার ফেরার অপেক্ষা না করেই চলে গেছে।

অন্যেরা, এমনকি সেই বুড়োও যা জানে না, তা আমি আবিষ্কার করেছি বলে যে আনন্দ তাও নয়, অবশ্য সেটাও বেশ খুসীর ব্যাপার। আমার আনন্দ নিজেকেই জয় করতে পেরেছি বলে।

এই হাস্যকর অভিযানের পর থেকে আমি কখনও কোনও রকম অজানা রহস্যকেই ভয় পাই না। এখন যখনই অজানা অজ্ঞাত কিছু দেখে ভয় পেতে সুরু করি তক্ষুনি সমুদ্র তীরের সেই সীলমাছের কথা মনে করি, যাকে দেখে আমি জলে ডোবা মড়া ভেবেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই হেসে ফেলি। একবার হাসলে পর আর ভয় থাকে না, তখন যেটাকে অজানা রহস্য বলে মনে হয় তার অত্যন্ত সহজ সাধারণ ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা সুরু হয়ে যায়।

তারপর অনেক বার রাত্তিরে শিকার করতে গিয়ে ভয়াবহ চীৎকার শুনেছি, কিসের চীৎকার তা বুঝতেও পারিনি। সকাল হলে পর মাটিতে বা বরফের উপর কোনও জন্তু বা বন মুরগীর পায়ের দাগ ধরে ধরে গিয়ে রাত্তিরে কিসের ভয় পেয়েছিলাম তা খুঁজে বের করেছি।

এই এখনকার কথাই ধর না। আবার আমি মধ্যদিনের রহস্যে ভরা নিস্তব্ধতা শুনছি। ঘরের জানলার সামনে একটা কাক দেখতে পাচ্ছি। কাকটা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে, শুয়ে আছেই বলা উচিত, ধুলোর উপর ডানাদুটো ছড়ান, ঠোঁটদুটো হাঁ করা ...

আরও দূরে, রাস্তার শেষে, একটা বাজপাখি ফার গাছের ডালে ডানা গুটিয়ে বসে আছে। ঠোঁটদুটো হাঁ করা কিনা তা আমার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে ও যে চুপ করে বসে আছে, চোখের সামনেই ধুলোর উপর অসহায়ভাবে বসে থাকা বোকা কাকটাকে তার নখ দিয়ে গেঁথে ধরবার এতটুকুও চেষ্টা করছে না, সেটাই যথেষ্ট।

বাজটা অবশ্য সকালে প্রচুর খেয়েছে, তাছাড়া এখন গরমে একেবারেই ক্লান্ত।

'ঘুমন্ত রাজকন্যার' গল্পের মত প্রকৃতিকেও যেন ঠিক দুপুরবেলা মন্ত্র পড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। চারিদিক এত চুপ হয়ে যায়। দেয়ালে ঘড়িটা একঘেয়ে শব্দে চলে যাওয়া মুহূর্তগুলো গুণে চলেছে। মুহূর্তগুলো কী তাড়াতাড়িই না যায়।

সূর্য, প্রাণের প্রজনক, তার উঁচু পথ ধরে নিচে দিগন্তের দিকে এগিয়েই চলেছে।

তার নিচে সজীব যা কিছু আছে শীগ্‌গীরই এই মধ্যদিনের মন্ত্র কাটিয়ে জেগে উঠবে।

—সিসেম, দরজা খোল!—কতবার এই অজস্র মণিমাণিক্যে ভরা সুন্দর পর্বতের খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি,—কিন্তু প্রতিবারই মুখের সামনে সেই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামাই না, কারণ জানি যতক্ষণ এই দুয়ার খোলার মন্ত্র আমার মনে থাকবে ততক্ষণ কিছুতেই কিছু এসে যাবে না।

সবচেয়ে রহস্যময় কল্পদ্বারও অত্যন্ত সহজ, সাধারণ চাবিতেই খুলে যায়। চাবিটা যদি খুঁজে পাও, তবে ভিতরের সব ধনদৌলৎ তোমারই হয়ে যাবে।

"সে"

(নবীন প্রাণিবিজ্ঞানীর বলা)

বন্য ও ভীষণ আল্‌তাই-এর উত্তুঙ্গ চূড়া;
মাথায় বরফের দীপ্তির শেষ নেই।

খম্যাকোভ্‌

সবে তাঁবু গেড়েছি, কিছু খেয়ে নিয়ে বিশ্রামের জোগাড় করছি, এমন সময় দেখলাম আমার যন্ত্রপাতির ব্যাগটাই গেছে হারিয়ে। এই অভিযানে আমি হচ্ছি প্রাণিবিজ্ঞানী, যন্ত্রপাতির ব্যাগ ছাড়া আমি একেবারেই অসহায়।

বিশ্রামের কথা ভুলে গিয়ে আবার ফিরে যাবার জন্য লাফ মেরে উঠলাম। রাত্রি আসার আগেই যদি ভাগ্যক্রমে রাস্তায় কোথাও পড়ে থাকতে দেখি।

অভিযানের নেতা—তিনি আবহাওয়া তত্ত্ববিদ—বললেন, 'এক মুহূর্ত দাঁড়াও। একটু খুঁজে দেখতে দাও—হুম্‌!—খুঁজে দেখি।'

আশার সঙ্গে তাঁর দিকে তাকালাম: যদি লুকিয়ে রাখাটা ভদ্রলোকের মতে রসিকতা হয়, যদি ধারে কাছেই কোথাও ব্যাগটা থাকে।

ভদ্রলোক পিছনে হাত মুড়ে, অন্যমনস্কভাবে চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। বুঝলাম কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছেন। বরাবরকার মত এবারও তাঁর মাপের যন্ত্রগুলির সঙ্গে তাঁর চেহারার অদ্ভুত মিল দেখে চমকে উঠলাম। ওঁর লম্বা

থার্মোমিটারে একটা চশমা এঁটে, কিছুটা দাড়ি লাগিয়ে দিলেই ওঁর প্রতিমূর্তি পাওয়া যাবে। ঠিক সেই রকমই খাড়া, শক্ত আর ঠাণ্ডা।

ভদ্রলোক খাঁটি খেয়ালভোলা বৈজ্ঞানিক, তার এই অন্যমনস্কতার জন্য অবশ গভীর মনোনিবেশের ফলে। সব সময়ে উনি কোনও সমস্যার সমাধান খোঁজেন নয়ত মনে মনে অঙ্ক কষেন। সেই কারণেই উনি কখনই চারপাশে কী ঘটছে সেদিকে নজর রাখেন না, এমনকি তাঁর মনুষ্য সঙ্গী, আমাদের প্রতিও না। কিন্তু খবরের বেলায় দেখবে ভদ্রলোক সব রকম খবরে বোঝাই।

...দেখি ত—হুম্—হ্যাঁ, তাই হবে,—চশমাটা সোজা করে আমার দিকে তাঁর ইস্পাতের মত ধূসর চোখ ফিরিয়ে বললেন।—ঠিক হয়েছে: শেষ যেখানে আমরা থেমেছিলাম, সেখানেও ব্যাগটা আমার হাতেই ছিল। ব্যাগটা বাক্সে ভরে রাখব ভেবেছিলাম। তারপর দেবদারু গাছের ডালে সেটাকে টাঙিয়ে অন্য কী একটা যেন বাক্সে ভরে রাখলাম। সেই-খানেই পাবে তোমার ঐ—কী যেন বলে, দেবদারু গাছে ঝুলছে।

মনে মনে ভদ্রলোককে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। শেষ যেখানে থেমেছিলাম সেখানে যেতে হলে সারারাত ঘোড়ার পিঠে চড়ে দৌড়তে হবে। এত খাটুনির পর, এই গুমোটের মধ্যে, দুপুরের দৈনন্দিন বিশ্রাম ছেড়ে এখন ঐ করি!

কিন্তু নান্যপন্থা। ফিরে যেতেই হবে।

কিছু পাঁউরুটি কোটের মধ্যে মুড়ে নিয়ে পোঁটলাটা জিনের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। তারপর দোনলা বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে খ্যাপা বুড়োটাকে রাগতভাবে ছোট্ট একটা 'গুড্ নাইট্' জানিয়ে আমার তিন বছরবয়স্ক তেজী ঘোড়া ভোরোংকোর পিঠে চড়ে ক্যাম্প্ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

একটি অইরৎ মেয়ে ছিল আমাদের পথপ্রদর্শক, সে তখন নদীর ধারে একটা মস্ত বড় পাথরের উপর বসে ছিল। শক্ত করে বাঁধা সাতটি বেণী তার কাঁধে আর বুকে সাপের মত পড়ে আছে, তাতে রূপোলি কাঁটা আর ফুলের চমক। গালের হাড়দুটো উঁচু, ছোট ছোট চেরা চোখ, উঁচু কপাল। তার সেই শক্তসমর্থ অনড় শরীরটি যেন যে পাথরে সে বসে আছে, সেই পাথর কেটেই তৈরী।

আমাদের অধিনায়কের অন্যমনস্কতার কল্যাণে আমায় কোথায় যেতে হচ্ছে, কেন যেতে হচ্ছে তাকে বললাম, মনের রাগ কারো কাছে প্রকাশ না করে থাকতে পারলাম না।

পাইপটা মুখ থেকে না নামিয়ে, শুধু চোখটা আমার দিকে ফিরিয়ে মেয়েটি দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বলল, তার চোখের সাদাটা জ্বলে উঠল।

—যেও না। কিছুতেই যেও না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

—কেন?

চোখের পাতা নামিয়ে কী শুনবার জন্য যেন মাথাটা একপাশে হেলিয়ে সে বলল, 'এরকম কর।'

আমি কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম।

সন্ধ্যাটা ছিল অস্বাভাবিক রকম শান্ত: পাখিগুলো পর্যন্ত চুপ করে গেছে, কেমন একটা আবছায়া অশান্তি আর উত্তেজনা অনুভব করলাম। যেন কেউ দমবন্ধ করে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, কিছু একটা বলবার জন্য মুখ খুলেছে কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারছে না।

সেই পাথরের মেয়ের চোখের পাতা খুলল, তার ঝকঝকে চোখদুটো আমার দিকে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইল।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে মেয়েটি বলল, 'ঘণ্টা বাজছে, শীগ্‌গীরই ছুটি হবে!' বোঝা গেল কথাটা সে শিখে মুখস্থ করে রেখেছে, খুব ধীরে ধীরে কথাটা উচ্চারণ করল, প্রত্যেক পদে জোর দিয়ে।

ওরা যে, যে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনাকেই 'ছুটির দিন' বলে তা জানতাম। কিন্তু কোনও ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলাম না, আল্‌তাই-এর এই নির্জন অঞ্চলে একশ মাইলের মধ্যে কোনও গ্রামও নেই। মেয়েটি যে কিসের আশায় রয়েছে তা বুঝতে পারলাম না।

—কিসের 'ছুটি'?—জিজ্ঞেস করলাম।

পাথরের মেয়েটি প্রায় ফিস্‌ফিস করেই বলল।

—'সে'।

হাসি চাপতে পারলাম না।

—আচ্ছা, ফিরে এসে 'তার' সঙ্গে ছুটি কাটাব অখন!

—অইরৎ মেয়েটি তার পাইপের চিবনো নলটা দাঁতে চেপে ধরে চোখের পাতা বন্ধ করল।

তার পাইপের নীল ধোঁয়ার কুণ্ডুলী বাতাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমাদের আলাপ শেষ হয়ে গেল। লাগামে টান দিলাম।

বনের ভিতরের পথ দিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম:

'এখানকার লোকেরা ছোট ছেলেমেয়েদের মত রূপকথার রাজ্যে বাস করে। শুধু অইরৎরাই নয়, পুরনো কালের রুশীরাও। চারিদিকের বন্য দৃশ্য বোধ হয় ওদের মনে এইসব ছাপ ফেলে, নানারকম সব অদ্ভুত রহস্যময় প্রাণী তারা কল্পনা করে বন ভরিয়ে দেয়, 'সে' হল তারই দৃষ্টান্ত।'

ইতিমধ্যেই এই সব পাহাড়ে একাধিকবার 'তার' কথা শুনেছি। শব্দটির অস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত গড়ন কেমন ভয়াবহ। যে কোনও অজানা রহস্য, দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক ঘটনারই নিশ্চয়ই এ অঞ্চলের লোকেরা এই নামকরণ করেছে। 'সে' নাকি 'ক্রমাগতই গড়িয়ে চলেছে'।

'সে' বনের মধ্যে পথ করে দিয়েছে,—এখানে 'সে' বলতে বোঝায় উল্কা। অন্যত্র 'সে' মৌমাছির বাগান শুদ্ধ একটা পুরো ক্ষেত খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমার ব্যাখ্যায় এ হল সাধারণ একটা ধস নামা। পাহাড়ে এরকম প্রায়ই হয়।

'সে' যে আসলে কী তা জানবার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু যাকেই জিজ্ঞেস করেছি সে হয় অর্থবোধকভাবে চুপ করে গেছে নয়ত হঠাৎ খাপছাড়াভাবে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমার নির্বোধ প্রশ্নের আর উত্তর দেয়নি। তার ফলে ব্যাপারটা নিছক অর্থহীন অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে মনে করেছি, রুশ রূপকথায় যে 'বাবা ইয়াগার' কথা আছে, হাতে ঝাঁটা নিয়ে উদুখলে চেপে যে আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, এও অনেকটা সেই জাতীয় চরিত্র।

আমার তখন অল্পবয়স, সহজে কিছু বিশ্বাস করি না। এই কুসংস্কারের মধ্যে যে দীর্ঘকালের পরীক্ষিত একটি সত্য আছে—প্রকৃতিকে ভাল করে দেখেশুনে নিখুঁতভাবে জেনে নেওয়া, অথচ তার কোন ব্যাখ্যা মেলে না—তা আমার চোখে পড়েনি। আমি মনে করেছিলাম যে কোন প্রাকৃতিক ঘটনারই কার্য কারণ আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, অজানাকে ভয় পাওয়ার কুসংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি। যা কিছু আমি বুঝতে পারতাম না, তাকেই কুসংস্কার বলে মনে করতাম।

পথটা আবার যখন নদী তীরে এসে পড়ল সন্ধ্যার আকাশ তখন সোনার আলোয় ভরে গেছে, আর তার গায়ে নদী পারের পাথুরে পর্বতমালার দৃঢ় ছায়া ফুটে উঠেছে। সেই পাহাড়ের মাথায় এমন সব অদ্ভুত মূর্তি জেগে উঠেছে যা প্যারীর নোত্র দামের চেয়েও বিচিত্র। রোদে জলে পোড়া পাথরগুলোর কোথাও দেখতে পাচ্ছি দৈত্যের মত একটা কাঠবিড়ালী ল্যাজ খাড়া করে বসে আছে; ডাইনী তার ঝাঁটার উপর সওয়ার হয়ে চলেছে; কোথাও বা চোখে পড়ছে পাশ থেকে লম্বা টিয়াপাখিনাক যাদুকরের মুখটা।

রয়েছে মস্ত মাথা প্রস্তরীভূত ভালুক, আর আক্রমণউদ্যত বন বিড়ালের বাঁকা পিঠ। এক জায়গায় হাতির মত বিরাট মাকড়সা; আর এক জায়গায় ডানাওয়ালা সিংহ। মূর্তিগুলো এত বাস্তব যে সত্যিই ঘোড়া থামিয়ে দেখতে লাগলাম।

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস বইয়ে যে সব ডানাওয়ালা জীবজন্তুর ছবি দেখা যায়, পাথরের পরিস্ফুট প্রান্তরেখায় সেই সব ছবি ফুটে উঠেছে।

ভাবলাম, 'কে জানে, হয়ত ইতিহাসের প্রত্যুষে এই পাহাড়টা দেখেই গ্রীকরা তাদের ডানাওয়ালা জীবজন্তুর কল্পনা করেছিল। যতদূর জানি সেই প্রাচীন কালে গ্রীকরা এই অঞ্চলে এসে আল্‌তাই-এর লোকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে। আল্‌তাই-এর লোকদের গ্রীকরা বলত সিদিয়ান। প্রাচীন গ্রীকরা বলে গেছেন সিদিয়ানদের স্বর্ণভাণ্ডার পাহারা দিত গ্রীফন, এক ধরণের ডানাওয়ালা জন্তু, যার বাজপাখির মত ঠোঁট, সিংহের মত গা।'

আবার ঘোড়া ছোটালাম। কিন্তু সেই পাহাড়ের তীক্ষ্ণ প্রান্তরেখা থেকে চোখ ফেরাতে বেশ কষ্ট হল। তার দুর্গম চড়াইয়ের গায়ে একটা গুহার কাল মুখ হাঁ করে আছে। হয়ত প্রাচীন কালে খসখসে লোম হায়েনা আর ভালুক, ধারাল দাঁত বিরাট বাঘ বা প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এই গুহায় আশ্রয় নিত। সেখানে ঝোপঝাড়ের শিকড় আর ঘাসে আটকে গিয়ে পাথরগুলো একটার ওপর আর একটা গাদা হয়ে এক কাণ্ড হয়েছে। মনে হল যেন অনেক উঁচু থেকে তারা বিরাট পাথুরে ধারায় ঝরে পড়ছে।

—দূর ছাই!—নিজেকে বললাম।—আমিও দেখছি ঐ অইরৎ মেয়েটার মত যত সব অদ্ভুত জিনিস কল্পনায় দেখছি।

ততক্ষণে নদী পার হবার জায়গায় এসে পড়েছি, পার হওয়া ব্যাপারটা এত বিপজ্জনক যে সেদিকেই পুরো নজর দিতে হল। আরও পরে আমার পথ চলে গেছে চারীশের শান্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। আল্‌তাইয়ের পাহাড়ে অঞ্চলের নদীগুলোর মধ্যে চারীশই হচ্ছে সব থেকে বড়, বরাবর দেশটার পূব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে।

সূর্যাস্তের আবছা রঙে পাহাড়গুলো আর চারীশ নদীকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল। নদীর নীল টলটলে স্বচ্ছ জল একেবারে তল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই আদিম দৃশ্য তার বন্য শক্তি আর অবর্ণনীয় সৌন্দর্য নিয়ে আমার চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। আর আমার মনে কত অসংখ্য চিন্তা, ছবি আর অস্ফুট আবেগ জাগিয়ে তুলছিল।

কিন্তু এই শান্ত সন্ধ্যায় আমার মনে যা সবচেয়ে বেশি ছাপ ফেলেছিল তা হল এর নিস্তব্ধতা। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—বড় বেশি গভীর, বোধ হয় সেই কারণেই কষ্টকর।

এমন সময় আমিও যেন এক শান্ত, অতিপ্রাকৃত ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলাম, যেন বাতাস-টাই টুংটাং করে বাজছে। সেখানেই থেমে গিয়ে, আওয়াজটা কিসের তা আবিষ্কার করবার ইচ্ছে একাধিকবার হল। কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

এক জায়গায় আমার পথ আটকে পড়েছিল একটা 'বোম্‌'—নদীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া একটা বিরাট পাথর। সেই পাথরের খাড়া পিছল পথ বেয়ে আমায় উঠতে হল। সারাক্ষণ পা ফসকে গড়িয়ে নদীতে পড়ে যাবার ভয় ছিল। অন্য জায়গায় প্রায় মাটির উপর চোখ লাগিয়ে চলতে হচ্ছিল। নইলে পথটা হঠাৎ কোথায় ঢালু হয়ে নেমে গেছে বোঝা মুশকিল।

নদীর ঐ পারের চেচুলিখা গ্রামটা যখন পেরলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু খুব বেশি যে দেরী হয়ে গেছে তা নয়। তাই, কোনও বাড়ির জানলায় একটিও আলো না দেখতে পেয়ে অবাক লাগল।

মনে হল, এরাও নিশ্চয়ই 'সে' আসবে বলে তৈরী হয়ে আছে। ওদের ভয় যদি 'সে' ওদের দেখতে পেয়ে বাড়ির উপর এসে পড়ে, আলো টালো সব উল্টে ফেলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বহুদূরে প্রায় মেঘের মাথায় একটা বড় লাল আলো দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগল। পাহাড়ের মাথায় নিশ্চয়ই খুব বড় একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালান হয়েছে, আমি যেদিকে যাব ঠিক সেই দিকেই—বরফঢাকা কোরগোন-এর দিকে—আগুনটা যেন আমায় দিক দেখাবার জন্যই জ্বলছে।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে কোরগোন গ্রাম পেরলাম, এই গ্রামটিও দেখলাম একেবারে জনশূন্য। কোনও জানলায় আলো নেই, পথে জনমানুষ নেই।

চারীশের একটি খরস্রোতা শাখা নদী হল কোরগোন। রাত্রে চাঁদের আলোয় তা পার হতে হবে। এই নদী পার হওয়া আরও কঠিন, কারণ এর খরস্রোতে যত পাথর টেনে এনেছে, পাথরগুলো আবার জলে ঘষা লেগে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধারাল হয়ে গেছে। ঘোড়ার পায়ে যে কোনও সময় এরকম এক-আধটা পাথর লেগে যেতে পারে: ঘোড়া যেই হোঁচট খাবে অমনি জলের তোড়ে সওয়ারী শুদ্ধ ভেসে যাবে, তারপর যখন চারীশ নদীর গভীরে গিয়ে পড়বে তখন থেঁতলান ভাঙাচোরা শরীর দেখে তাদের আর চেনবার উপায় থাকবে না।

ভোরোংকো নির্বিঘ্নেই নদী পার হল।

তীরে গিয়ে বোঁচকাটা ভাল করে বাঁধব বলে ঘোড়া থেকে নামলাম। দেখলাম মাটির ঘন ঘাসগুলো একেবারে শুকনো। সাধারণত কিন্তু এই ঘাসের শিশিরে পা একেবারে ভিজে যায়। আজ এত শুকনো দেখে অদ্ভুত লাগল।

এতেও আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আমার কোনও চেতনা হয়নি।

কানের উপর শাঁখ চেপে ধরলে যেমন আওয়াজ হয়, বাতাসে ঠিক সেই আওয়াজ।

আরও এগিয়ে গিয়ে আমায় পায়ে চলা পথ ছেড়ে চারীশ-এর দক্ষিণে যেতে হবে। পাহাড়ের শ্রেণীর মাঝখানে একটা সংকীর্ণ খাদের ভিতর দিয়ে চললাম। সে এক ভীষণ

সুড়ঙ্গ, অইরৎরা এই জাতের খাদকে বলে 'আয়ু কেপ্‌চাস্‌'— ভালুকের পক্ষেও দুর্গম।

ভাগ্যক্রমে, বুনো জন্তু শিকারীদের এই পথটা আমার জানা ছিল। বিরাট খাদের উপর পাহাড়ের ঘন ছায়া পড়েছে, কিন্তু বেশ দ্রুত দৃঢ় পায়ে পথ বেয়ে উঠে গেলাম। পাহাড়ের মাথার আলোটা থেকে থেকেই কেঁপে উঠে সত্যিই পথ দেখাতে লাগল।

কয়েকদিন আগে এই ভয়ংকর খাদেই ঈগলপ্যাঁচার ভীষণ চীৎকারে কানে তালা ধরে গিয়েছিল। প্রথমে একটা চীৎকার করে উঠল, আরেকটা তার উত্তর দিল, পাহাড় সেই শব্দ লুফে নিয়ে প্রতিধ্বনি তুলল, সারা খাদ সেই গর্জনে কেঁপে উঠল। সে এক ভীষণ ঐকতান।

কিন্তু এখন রাত্তিরের ভয়ংকর প্রেতাত্মা, পেঁচারাও নিস্তব্ধ।

খাদটা গিয়ে খুব উঁচু না হলেও, ভীষণ খাড়া এক বর্ত্মে শেষ হল। ঘোড়া থেকে নেমে লাগামের ফাঁসটা ধরে ভোরোংকোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম।

বর্ত্মের মুখে উঠে চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া এক প্রান্তরে এসে পৌঁছলাম। মাঠের সব ঘাস কেটে গাদা করে রাখা হয়েছে।

এইখানেই আমায় এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছিল যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তার জন্য একমাত্র আমিই দোষী।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি আর চমৎকার রাতটার সৌন্দর্যের তারিফ করছি।

হঠাৎ ভোরোংকো প্রচণ্ড এক লাফ মেরে, লাগাম টাগাম ছিঁড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণ জোরে ছুটে বনের ভিতর ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা কী বুঝতে না পারলেও অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলাম। কিসের বিপদ না জেনেই, তাড়াতাড়ি কাঁধে ঝোলান দোনলা বন্দুকটা হাতে তুলে নিলাম।

কিন্তু কাকে গুলি করব, কিছুই ত নেই। বন্দুকটা নামিয়ে ফেললাম।

ঠিক সেই সময়েই দূরের বরফ ঢাকা পাহাড় চূড়া থেকে একটা প্রচণ্ড গুমগুম শব্দ শুনতে পেলাম।

ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতে পারলাম না। বাজ বা ধস নামার আওয়াজ ত এ নয়। বরং দূরে কোনও প্রচণ্ড শক্তির বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে এর মিল আছে। তারপর এল এক ভীষণ গর্জন।

সেই চাপা গর্জন যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই বেড়ে উঠল। শেষে এমন ভীষণ হয়ে উঠল যে আমি ভয়ে কাছের ঘাসের গাদার দিকে দৌড় মারলাম। পাহাড়ের চুড়ো থেকে যে ভয়াবহ, অদৃশ্য জিনিসটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে তার কাছ থেকে লুকিয়ে পড়ার জন্য ঘাসের গাদায় ইঁদুরের মত ঢুকে পড়লাম।

সেই গর্জন ভীষণ বেগে এগিয়ে এল। আমার লুকবার জায়গা থেকে বাইরে তাকালাম: মাঠের ওপারে পাহাড়ের গায়ের বন ঘাসের শিষের মত হাওয়ায় দুলছে। যে চাপা গর্জনে আকাশ বাতাস ভরে গেছে বনের শব্দ তাতে মিশে যাওয়ায় তার আওয়াজ শুনতে পেলাম না।

মনে হল যেন পাহাড়ের বরফ ঢাকা চূড়া থেকে একটা বিরাট দৈত্যকে বাতাস নিচে ঠেলে আনছে আর মারাত্মক ঘূর্ণিহাওয়া সবকিছু ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়ে তার পথ তৈরী করছে। কিন্তু জিনিসটা কী?

—'সে'।—শব্দটা মনে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে শরীর শক্ত হয়ে গেল, হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুক থেমে গেল, চোখ বুজে ফেললাম।

'সে' পেরিয়ে চলে গেল।

সারা বিশ্ব যেন আমার মাথার উপরে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। দৈত্যটার গরম নিঃশ্বাস আমায় মাটিতে চেপে ধরে উপর দিয়ে বয়ে চলে গেল,—অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

ফাঁকা মাটির উপর যখন জ্ঞান হল, তখন আকাশের অনেক উঁচুতে শান্ত চাঁদ।

কী হয়েছে প্রথমে তা কিছুই মনে পড়ল না। সত্যিই, হয়েছে কি?

হয়ত সবই আমার অদ্ভুত কল্পনা, অসুস্থতা—সাংঘাতিক মানসিক বিকৃতির ফলে ভুল দেখতে দেখতে ভীষণ দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করেছি। বোধ হয় কিছুক্ষণ ক্ষ্যাপার মত সব উদ্ভট জিনিস দেখে এখন আবার শান্ত হয়েছি।

কিন্তু আমি ত ঘাসের গাদার তলে ঢুকে গিয়েছিলাম... কই আমার উপরে ত কোনও ঘাসের গাদা নেই।

দাঁড়িয়ে উঠে চারিদিক দেখতে লাগলাম।

অন্য ঘাসের গাদাগুলোও উবে গেছে; মাঠের বুকের উপর এলোমেলো ঘাস ছড়ান, মাঝে মাঝে কালো কালো ছোপ। বন শান্ত।

আমার ঘোড়াটাও অদৃশ্য।

চারিদিক এত নিশ্চুপ, ভাবলাম, কালা হয়ে যাইনি ত?

লাফিয়ে উঠে জোর শিস দিলাম — ভয় ছিল যদি নিজের শিস নিজেই না শুনতে পাই।

শিস দেওয়া মাত্র বনের ভিতর থেকে একটা পরিচিত চিঁহিস্বর ভেসে এল।

ভোরোংকো প্রায় মাটিতে ঝুলে পড়া বোঁচকা নিয়ে দৌড়ে এল। ঘোড়াটাকে পেয়ে এত আনন্দ হল, মাথাটা জড়িয়ে ধরে ওর উষ্ণ নরম ঠোঁটে জোরে চুমু খেলাম।

ঘোড়াটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, চোখ উল্টে আমার গায়ে সাপটে লেগে রইল।

তবে বেঁচেই আছি। কিন্তু সারা পৃথিবীতে একমাত্র আমি রয়েছি,— আমি আর আমার এই বিশ্বস্ত বন্ধু ঘোড়া ছাড়া আর কোনও প্রাণী কি নেই? 'সে' কি পৃথিবীর বুক থেকে অন্য সবাইকে খড়কুটোর মত একেবারে মুছে ফেলেছে?

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার পথপ্রদর্শক সেই আলোটা অদ্ভুত অস্থিরভাবে জ্বলছে। আগুনটা কিছুক্ষণ থেমে হঠাৎ একেবারে নিভে গেল।

'সবাই ঘুমতে গেল আর কি,— নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম।— নিশ্চয়ই লোকজন সব আগুন নিভিয়ে ঘুমতে গেল।'

তখন মনে পড়ল আমি কেন এখানে এসেছি; কোথায় যাচ্ছি?

একটা মাত্র দেবদারুগাছওয়ালা পাহাড়টা, যেখানে আমরা গতরাত্রে থেমেছিলাম নিশ্চয়ই কাছেই হবে, ঐ মাঠটা পেরিয়ে। বেয়ে উঠতে ঘণ্টাখানেক লাগবে।

কিন্তু আগের অভিজ্ঞতায় তখন এত কাবু হয়ে পড়েছি যে আর চলতে পারছি না। ঠিক করলাম বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে কোথাও রাত্তিরটা কাটাব।

ভোরোংকো কুকুরের মত আমার পিছন পিছন চলল।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট এগোতেই দেখি সামনেই মাটির উপরে একটা উপড়োনো গাছের অন্ধকার ছায়া পড়ে রয়েছে।

কাছে গিয়ে দেখলাম একটা মস্ত পুরনো দেবদারু গাছ শিকড় টিকড় শুদ্ধ একেবারে মাটি থেকে ছিঁড়ে উঠে এসেছে। মাটিতে আছড়ে পড়ার সময় কতগুলো মোটা ডাল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে চারিদিকে ছিটকে গেছে। উপরে তোলা অন্য ডালগুলো যেন বিরাট বিরাট হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে। সেই ডালগুলোর একটার গায়ে দাঁড়কাকের বাসার মত একটা গোল কালো ছোপ।

হাত বাড়াতে শক্ত চামড়ার মসৃণ গায়ে হাত ঠেকল। আমার ব্যাগটা কি?

ডালে বাঁধা স্ট্র্যাপ খুলে ব্যাগটা নামিয়ে নিলাম।

সত্যিই আমার ব্যাগ, খুলে দেখলাম যন্ত্রপাতি সবই ঠিক আছে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল—ঘোরের মধ্যে রয়েছি কি? কিন্তু এই বিস্ময়ে বড় আনন্দ হল, আর কোথাও তবে আর যেতে হবে না। একটু বিশ্রাম করে আবার অভিযানের কাজে ফেরা যাবে।

—থলেটা ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে গেল! আমাকে 'সে' সত্যিই খুব দয়া দেখিয়েছে। কিন্তু কী প্রচণ্ড শক্তি—শ খানেক বছরের পুরনো একটা দেবদারু গাছকে উপড়ে নিয়ে পাহাড়তলী, বন, তার মানে এক মাইল পথ পার করে ছুঁড়ে ফেলেছে!

জিন টিন খুলে ভোরোংকোকে ঘাস খাবার জন্য ছেড়ে দিলাম। তারপর কোট মুড়ি দিয়ে উপড়োনো দেবদারু গাছটার ডালগুলোর তলে শুয়ে পড়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম, গভীর ঘুম, খাবার কথা একবারও মনেও পড়ল না।

ঘুম ভাঙল যখন তখন পাহাড়ের বেশ উঁচুতে সূর্য উঠেছে।

পৃথিবীটা একেবারে বদলে গেছে। কোনও কিছু দেখেই গতদিনের নিস্তব্ধতার কথা বোঝার উপায় নেই। বরফ ঢাকা পাহাড় চুড়ো থেকে জোর গরম হাওয়া বইছিল, সমস্ত বন চাপা গর্জন করে উঠছে।

গতরাত্রের অভিজ্ঞতাকে স্বপ্ন ছাড়া কিছুই মনে হল না। তখন যে ছোট ছেলের মত ভয় পেয়েছিলাম সে কথা এখন ভেবে হাসি পেয়ে গেল। কিছুই না কেবল একটা জোর দমকা হাওয়া, ঘণ্টায় বেশ কয়েক মাইল বেগে বয়ে যাওয়া ঝড়। পাহাড়ের গায়ের ঐ গাছটা বা ঘাসের গাদা তা অনায়াসেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঝড়ে ত বাড়ির চালাও উড়ে যায় এমনকি বাড়ি ভেঙেও পড়ে।

পৃথিবীর সবকিছুই এত ভাল, এত নির্ভরযোগ্য—দেখতে কী ভালই লাগে। যে পাহাড়ের উপর নিজেকে দেখতে পেলাম, তাকে সরিয়ে নিতে পারে এমন কোনও শক্তি পৃথিবীতে নেই। এই সকালের আলোয় চারদিকের সবকিছুই এত স্থায়ী, এত নিরেট আর প্রত্যক্ষ: যে দেবদারু গাছে হেলান দিয়ে আছি তার প্রকাণ্ড কাণ্ড, পাহাড়ের পাথরগুলো,

সারি সারি গাছ্শেওলা আর ছেঁড়াখোঁড়া উপড়নো ঘাসের শিষ, সবকিছুই স্পষ্ট করে, আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি।

এমনকি বাতাস পর্যন্ত যেন স্পর্শগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে, তার অদৃশ্য স্থিতিস্থাপক শরীর আমার বুকে, মুখে এসে পড়তে লাগল। বাতাস ক্রমশই জোর হয়ে উঠছে।

ঝড়ে পরিণত হবার আগেই রওনা হতে হয়।

শিস দিয়ে ঘোড়াটাকে ডাকলাম। রুটি যা ছিল তা ওর সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে কোট আর ব্যাগটা জিনের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে উৎরাইয়ের পথে চলতে সুরু করলাম। বন ততক্ষণে সোঁ সোঁ সুরু করেছে।

পায়ে চলা পথে নিরাপদেই পৌঁছলাম। বাতাস তখন প্রবল ঝড়ে পরিণত হয়েছে। নদীর ফুলে ওঠা জলকে যেন গভীর খাত থেকে সশরীরে তুলে নিয়ে পাহাড়ের ঢালু গায়ে গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে জল ছিটিয়ে যাচ্ছে। বন গুমরে উঠছে। বনের ভিতর থেকে অনবরত উপড়োন গাছ ভেঙে পড়ার আওয়াজ আসছে।

এই পাহাড়ে ঢাকা উপত্যকার মাঝখানেও নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, একেক সময় ত ভীষণ গরম ঘূর্ণি হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

জগতের স্থায়িত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ধূলিসাৎ হল। দুশ্চিন্তায় পড়লাম: 'সে' আমার প্রতি ত এত দয়া দেখাল, কিন্তু নিচে কী কাণ্ড ঘটিয়েছে কে জানে। হয়ত আমার সঙ্গীদের আর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা অইরৎ মেয়েটিকে উড়িয়ে নিয়ে নদীতে ফেলেছে?

কোরগোন গ্রামে গিয়ে প্রথম ভয়ের খবর পেলাম। আমার পরিচিত এক বুড়ো শিকারী বলল 'উপরের অপদেবতা' সে রাত্রে ভীষণ ক্ষতি করে গেছে। বরফ ঢাকা চুড়ো থেকে একটি ছেলে এইমাত্র ফিরে এসেছে--তার সঙ্গে যে চারজন লোক ছিল তাদের পাত্তা নেই, ছেলেটা ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। বরফ ঝড়ে তাদের আগুন নিভে যায়, অন্য লোকরা পথ হারিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরে গেছে।

আমার সেই 'পথপ্রদর্শক' আলোর কথা মনে পড়ল, কিন্তু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামে ভিজতে ভিজতে কুয়াসা, বরফঝড়, তুষার ধারার কথা মেনে নিতে পারাটা বেশ কষ্টকর মনে হল।

লাগামে আরও জোর টান দিলাম।

একেক জায়গায় ঝড়ে উপড়োন গাছ পথ আটকে পড়ে রয়েছে। নদীর ওপারের পাহাড় শ্রেণীর সেই অদ্ভুত পাথরের মূর্তিগুলোর দিকে যাতে চোখ না পড়ে সেই চেষ্টা

করলাম: এখন তাদের দেখে সত্যিই ভয় করতে লাগল। ঐ পাহাড়ের ওধারেই আমাদের তাঁবু পড়েছে। ডানাওয়ালা সিংহটা যদি তখন পাহাড়ের গা থেকে আলাদা হয়ে আমার দিকে লাফিয়ে আসত তাতেও এতটুকু বিস্মিত হতাম না।

অদ্ভুত কল্পনা আর বাস্তব—সবই আমার মনে মিলেমিশে এক হয়ে গেল। প্রত্যেক মুহূর্তে অভিযানের সঙ্গীদের জন্য উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠল। পাহাড়ের গায়ে তাদের থেঁতলানো শরীরগুলোর ছবি চোখের সামনে ভাসতে লাগল, তাদের চেনার আর উপায় নেই।

ভোরোংকোকে ছুটিয়েই চললাম।

ছাউনীর দিকে যাবার বনপথে পড়েই হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলাম।

সেই অপ্রাকৃতিক ঘণ্টার ক্ষীণ ধ্বনি আবার পরিষ্কার শুনতে পেলাম। সত্যিই, বনের শব্দ আর হাওয়ার আওয়াজ ছাপিয়ে পরিষ্কার ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছিল।

'ঘণ্টা বাজছে—শীগ্‌গীরই ছুটি হবে।'—অইরৎ মেয়েটির কথাগুলো আবার মনে পড়ল। মেয়েটি যে তার মৃত্যুর আভাস পেয়েছিল, এখন তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি। বড় ব্যথা পেলাম। ওঃ, এই উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা আর সওয়া যায় না।

ভোরোংকো ডেকে উঠল।

এমন সময় পথের বাঁক ফিরে এগিয়ে এল আমাদের পথপ্রদর্শক, সেই অইরৎ মেয়েটি।

পিঠে ঝোলান বেণীগুলোতে ছোট ছোট রূপোর ঘণ্টা, আল্‌তাই-এর মেয়েরা যেমন পরে।

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম, আমায় দেখে মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। ঐ পাথরের মত গা-এ রং ধরা দেখতে চমৎকার লাগে।

ক্যাম্পে সবাই ঠিকই আছে।

আমাদের জ্ঞানী আবহাওয়াতত্ত্ববিদ, তাঁর থার্মোমিটারের মতই তিনি সবসময় ঠাণ্ডা ধীরস্থির, পাহাড়ে ঝড়ের একটি যথাযথ ব্যাখ্যা আমায় শোনালেন।

সংক্ষেপে কারণটা হল এই, বরফ ঢাকা চূড়ার একটা দিকের হাওয়ার চাপ, কী করে যেন, অন্য দিকের চেয়ে বেড়ে গিয়েছিল। রাত্তিরবেলা তার প্রথম ধমকটা পাহাড়ের উপর বুলেটের মত ফেটে পড়েছিল। সকালে আসল হাওয়াটা পার হয়ে গেছে। পাহাড়ের মাথায় এর ফলে তুষার ঝঞ্ঝা হয়েছে। উপত্যকায় নেমে, হাওয়াটা জমে ঘন হয়ে গিয়ে ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে।

আমাদের পণ্ডিত নেতা এই ঝড়ের নাম বললেন, 'ফোয়েহ্ন্।'

কোরগোনের শিকারী একে বলেছেন 'উপরের অপদেবতা'।

অইরৎ মেয়েটি এর একটা রহস্যময় নাম দিয়েছিল: 'সে'।

কিন্তু 'উপরের অপদেবতা' বা 'সে' কিম্বা 'ফোয়েহ্ন্'—উঁচুর দেশের আবহাওয়ার এই অদ্ভুত অবস্থার সত্যিই ভীষণ শক্তি। যে একবার এই উন্মত্ত আদিম প্রাকৃতিক ঘূর্ণির মুখে পড়েছে সে পরের বার 'ঘণ্টা বাজছে—শীগ্‌গীরই ছুটি হবে' এই বিপদসংকেত শুনেই কেঁপে উঠবে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে—আমাদের জ্ঞানী আবহাওয়াতত্ত্ববিদ যা বুঝতে পারেননি, ঐ অত্যন্ত সাধারণ অইরৎ মেয়েটি তা ঠিক আগেই ধরতে পেরেছে। আবহাওয়ার থমথমে ভাব দেখেই কী ঘটবে তা বুঝতে পেরেছে।

তোমরা যাই বল, এমন লোককে আমি খুবই তারিফ করি।

বোবা পাখি

(বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের বলা)

নিস্তব্ধতার কথা বলছ, তবে এই বুড়োর কাছ থেকে কিছু শোন।

স্বীকার করছি গল্পটা আমার মত অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খুব গৌরবজনক নয়। তবে ঘটনাটা বেশ মজার, আমার একেবারে বাচ্চা নাতনী তার জন্য দায়ী। আর তার কারণ আমরা... কিন্তু একেবারে গোড়া থেকে সুরু করাই ভাল।

নোভ্‌গরদ অঞ্চলের মশেন্স্কি জেলায় চতুর্থবার গ্রীষ্ম কাটাতে গিয়েছি। আমি হলাম পক্ষী বিশারদ, ঐ অঞ্চলের সব পাখিদের কথা জানতে চারটে গ্রীষ্মই যথেষ্ট। আগের বসন্তে এবিষয়ে একটা ছোট্ট বইও লিখে ফেলেছি, বইটা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

সে বছর মে মাসের শেষ দিকে গ্রামে এসেছি। আমার নাতনীটি প্রায়ই আমার সঙ্গে ঘুরতে যেত। বনজঙ্গল আর পশুপাখি সে খুবই ভালবাসে। আমিও অবশ্য তাকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পাখিদের চিনতে শিখিয়েছি—আমি যাকে বলি 'চোখ আর কানের চেতনা'।

আমাদের চারদিকে যা ঘটে তার অনেকটাই আমরা দেখতে জানি না। আমরা যখন কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠি, তখন শুধু সে বিষয়ের সঙ্গে যেটুকুর সম্পর্ক সেইটুকুই দেখি। তাই জাহাজের পথ দেখায় যে সে আকাশের তারার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়, পথের সন্ধানের জন্য তাকে তারার সাহায্য নিতে হয় বলে তাদের অনেক কথাই সে জানে। বৈমানিকের কানে এঞ্জিনের শব্দের সুর ভাল করে বসে গেছে, আমরা অবশ্য মাথার উপরে সেই আওয়াজ শুনে প্রায়ই বিরক্ত হই। চিত্রকর যে সে এমন সব আলো আর রং দেখতে পায় যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এমনকি পটের বুকে বা কাগজে আঁকলে পর আমাদের কাছে তা অবাস্তব বলে মনে হয়।

পক্ষী বিশারদের চোখ আর কান, বলাই বাহুল্য, প্রধানত পাখির খোঁজের জন্যই তৈরী। তুমি আর আমি হয়ত বনের মধ্যে দিয়ে কিম্বা সহরের কোথাও গল্প করতে করতে হাঁটছি, তুমি খেয়াল করবে না, কিন্তু আমার মনে আপনা থেকেই ধরা পড়বে, কোথায় টিট্‌মাস কিচ্‌মিচ্‌ করছে, হয়ত কাছের ঝোপেই জে পাখির নীল ডানা ঝলসে উঠল কিম্বা ছাদের উপর দিয়ে কাক 'কা' করে ডেকে উড়ে চলে গেল।

নাতনীকে আমি পাখিদের কথা, তাদের ডাক, গান, ওড়ার ভঙ্গী—সবকিছু বলেছিলাম। ও তখনই অনেক রকমের পাখির ডাক শুনেই চিনে ফেলতে পারত। কিন্তু স্বভাবতই ওর অভিজ্ঞতা অল্প আমার মত ও জানবে কী করে, আমি কত পাখি দেখেছি। তাই গ্রীষ্মের খুব গোড়ার দিকে সে যখন দৌড়ে বন থেকে বেরিয়ে এসে বলল:

—দাদু, তুমি বোবা পাখি চেন? ওর কথা আমাকে কেন বলনি?—তখন বড় কৌতুক বোধ করলাম।

—দাঁড়াও, একমিনিট অপেক্ষা কর,—আমি বললাম।—তোমার এই বোবা পাখিটি কী জাতের পাখি? নিশ্চয়ই তোমার সেই জুমজিক্ আর মোমিকের মত কিছু আবার বানাচ্ছ।

নাতনী আমার খুবই কল্পনাপ্রবণ। এই অল্প কিছু আগেও তার মা দেখেছে, সে একা একা বাগানে খেলতে খেলতে কথা বলে চলেছে, কখনও মোমিক্ নামের কারো সঙ্গে, কখনো বা জুমজিক্। মা যখন জিজ্ঞেস করেছে, কার সঙ্গে কথা বলছ তখন, সে হাত নেড়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলেছে: 'তুমি কিচ্ছু বোঝ না, মা। মোমিক্ আর জুমজিক যে এখানেই থাকে—ওদের সঙ্গে খেলতে কী মজা!'

ওর মা অনেক প্রশ্ন করেও মেয়ের খেলার সঙ্গী যে কারা তা আবিষ্কার করতে পারেনি — মানুষ নাকি কোন উদ্ভট কল্পিত জন্তু তাও না।

আমি ওভাবে কথা বলাতে নাতনী রেগে আগুন।

— মোটেই বানাইনি! নিজের চোখে দেখেছি, একটা ছোট্ট কুঁজো পাখি, গাছের একেবারে সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে আছে। খালি হাঁ করছিল, আর গলা কাঁপছিল, কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরচ্ছিল না।

বেচারীর মনে আঘাত দিতে চাইলাম না। বিশ্বাস করার ভাণ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় দেখলে?'

— মাঠের ভিতরের ঐ নদীটার ধারে, একেবারে বনের গায়ে, যেখানে তুমি বাড়ি ফেরার পথে সবসময়ে বসে বসে সিগারেট খাও।

— তাই নাকি, শুনে ত ভারি কৌতূহল হচ্ছে, — আমি বললাম, — এর পর যখন যাব তখন আমায় দেখিও ত পাখিটা।

— কিন্তু ও উড়ে যাবে না ত?

— না, না, কিছুতেই না! পাখিরা এখন সব বাসা বেঁধে থাকে। যেখানে গান করছিল ঠিক সেইখানেই থাকবে।

পরের দিন বনে গেলাম। বলা বাহুল্য, সেই অদ্ভুত 'বোবা পাখির' কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন নাতনী আমার সঙ্গে আসেনি — সে তার মার সঙ্গে গ্লোব ফুল তুলতে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল বন নিশ্চুপ হয়ে গেছে: পাখিরা একের পর এক গান বন্ধ করে দিয়েছে। দু তিন মিনিট পরে বুঝতে পারলাম, কেন থামিয়েছে: হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল, জোর হাওয়া উঠল, সেই সঙ্গেই প্রায় বৃষ্টি নামল মুষলধারে।

গ্রীষ্মের প্রথম দিকে যেমন হয়, বৃষ্টিটা ঝম্‌ঝম্‌ করে নেমে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তার কী আওয়াজ! বন থেকে বেরিয়ে ফাঁকায় এসে পড়লাম। বনের সেই ভীষণ শব্দের পর ফাঁকা মাঠের নিশ্চুপ ভাব দেখে অবাক লাগল। আমার পিছনের গোলমাল আর সামনের নিস্তব্ধতার মাঝখানে রয়েছে গাছের প্রাচীর। মাঠে কিম্বা বনে কোথাও পাখিরা গান গাইতে সুরু করেনি; বাতাস তখনও থামেনি, গাছের গায়ে চাবুকের মত এসে লাগছিল, তার ফলে বৃষ্টির জল প্রবলধারে ছিটকে পড়ছিল। উপরের ডাল

থেকে নিচের ডালে, নিচের ডাল থেকে মাটিতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি যেন তখনও সারা বনে শোর তুলে বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঝরে পড়ছে। ওদিকে মাঠের মধ্যে গাছের সংখ্যা খুবই কম, যা আছে তাও দূরে দূরে, তাই খুব বেশি বাতাস পাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা আগেই ঝরে পড়ে গেছে।

বরাবরকার মত সে বারও নদী পারের গাছের গোড়ায় সিগারেট খাবার জন্য বসলাম। সেই সঙ্গে অবশ্য নিস্তব্ধতার সুরও শুনব, এরকমই ইচ্ছা।

নিস্তব্ধতারও রকমফের আছে। বৃষ্টির জলে নতুন হয়ে ওঠা প্রান্তরের এই নিস্তব্ধতা মোটেই সম্পূর্ণ নিঃশব্দ নয়। আমরা শুনতে পাই না এমন অসংখ্য ছোটখাট আওয়াজে এই নিস্তব্ধতা ভরা, প্রকৃতির বুকে রাত্রি দিন যেমন হয়ে থাকে : ঘাসের ক্ষীণ সাঁই সাঁই শব্দ, ঢিবির মাঝখান দিয়ে ছুটে যাওয়া ইঁদুরের খচ্‌মচ্‌ — সে আওয়াজ বোধ হয় একমাত্র পেঁচারা শুনতে পায় — পাতা থেকে জল পড়ার টুপটাপ আওয়াজ, নদীর শান্ত কলস্বর। এমন কি আমার বাঁ দিকে কোথাও গঙ্গাফড়িং-এর চিঁচিঁও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। এই আওয়াজ অন্য শব্দের চেয়ে জোরাল হলেও ফিঙ্গে পাখির সুরেলা গান, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ বা মানুষের গলা যেমন এই নিস্তব্ধতাকে ভাঙতে পারে, তা পারেনি। নিস্তব্ধতাকে যদি প্রান্তরের মূক ঐকতান বলা যায় তবে এ হল তার সঙ্গৎ।

হঠাৎ কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। বুড়ো হয়ে গেছি, বসে বসে সেই সুন্দর নিস্তব্ধতা শুনছি, কিন্তু সেই নিস্তব্ধতার সবকিছুই আমার জানা, প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়া বইয়ের মত। যে কোনও পাখি একটু গান গেয়ে উঠুক বা কাঁচের গায়ে ছুরি চালানর মত পাৎলা শব্দ করুক, আমি ঠিক বলে দিতে পারব কী পাখি ডাকছে, কোথায় ডাকছে। কিন্তু শিশুরা এখনও কত কী আবিষ্কার করতে পারে — পৃথিবী তাদের কাছে কত অত্যাশ্চর্য ব্যাপারে ভরা। একথা ভাবতে ভাবতে নাতনীর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তার মোমিক্ আর জুম্‌জিক্ আর তার সেই অদ্ভুত 'বোবা পাখি'। এসব নিয়ে সে কেমন ফুর্তিতে আছে, কী সুখী সে — ঠিক এই মুহূর্তেই হয়ত তার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে অত্যাশ্চর্য কিছু।

কী দারুণ উত্তেজনা, কী চমৎকার অনুভূতি। মানুষের বয়স হলে তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান — যা সমগ্র মানবজাতির অভিজ্ঞতার ফল — আর তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই অনুভূতি অসাড় হয়ে যায়, তবে তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। যতই

জ্ঞানসংগ্রহ করি না কেন, রহস্য আর অত্যাশ্চর্যের প্রতি কখনই আমাদের বিশ্বাস হারান উচিত নয়, কাল যদি তার সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলেও না।

এতক্ষণ আমার ভাবনা বেশ ধীর পায়ে একই দিকে চলেছিল, এইখানে এসে হঠাৎ পথ ছেড়ে একটা থেকে আরেকটা বিষয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল।

বোধ হয় বনের ধারে একটা থ্রাশ্ পাখির ভয়ার্ত চীৎকারই তার কারণ। উত্তেজিত হলে থ্রাশ্ এমন ভীষণ চীৎকার করে ওঠে, মনে হয় যেন কেউ তার ল্যাজ পাকড়ে ধরেছে।

কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে পাখিটা থেমে গেল। সেই চ্যাঁচামেচির পর মাঠটা যেন গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবে গেল, আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে গঙ্গাফড়িং-এর ক্ষীণ ঐকতান আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হঠাৎ উপলব্ধি করলাম তা ত হতে পারে না। গ্রীষ্মের এই সুরুতে যখন গ্লোব ফুলরা ফুটে আছে তখন গঙ্গাফড়িং বনের মধ্যে কী করতে আসবে। এ জায়গায় জুলাই-এর আগে গঙ্গাফড়িং-এর গান শুনতে পাওয়া যায় না।

হঠাৎ বোঁ করে বাঁয়ে ঘুরে গেলাম, এত জোরে ফিরলাম যে হাত থেকে সিগারেটটা ছিটকে পড়ে গেল।

আমার নাতনী ত ঠিকই বলেছে: ঐ ত, নদীর পাড়ের অল্‌ডার গাছটার একেবারে উপরের ডালটায় একটা ছোট্ট কুঁজো পাখি বসে আছে। সে তার ঠোঁট খুলেই চলেছে; ফোলা বুকে পালকগুলো কাঁপছে, কিন্তু আওয়াজ বেরচ্ছে না। কেবল গঙ্গাফড়িংগুলো জোরে চেঁচাচ্ছে।

আমার এরকম হঠাৎ নড়ে ওঠায় বোধ হয় পাখিটা ভয় পেয়ে গেল, ডাল থেকে পাথরের মত ছিটকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই সঙ্গেই গঙ্গাফড়িংদের গানও থেমে গেল।

ঐ এক নজরেই অবশ্য আমি পাখিটাকে চিনে ফেললাম: ছোট্ট কুঁজো শরীর, ভয় পেলে উঁচু ডাল থেকে পাথরের মত নিচে পড়ে গিয়েই ঘাসে লুকিয়ে যাওয়া, তারপর তার সেই নিজস্ব সুর—সবকিছুই বড় গঙ্গাফড়িং-এর সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। এটা ক্রিকেট্ পাখি—সাধারণ ক্রিকেট্ পাখিরই একটা জাত, কিম্বা বাগানে যে সব ক্রিকেট্ পাখি পাওয়া যায় তারই রকমফের।

তোমরা হয়ত ভাবছ, এই পাখি নিয়ে এত আলোচনা করার কী আছে, কিন্তু একবার ভেবে দেখ: তিনবছর ধরে আমি ঐ অঞ্চলের পাখির ডাক শুনে বেড়াচ্ছি, এমনকি

ওবিষয়ে একটা বইও লিখেছি যা আমার ধারণায় সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ,—কিন্তু তবুও এই পাখিটার কথা বাদ দিয়ে গেছি। কেন জানি না মনে হয়েছিল এ অঞ্চলে এ জাতের পাখি থাকতে পারে না। গাছের গোড়ায় বসে ঐ জায়গা থেকে নিশ্চয়ই অনেকবার ওর গান শুনেছি, কিন্তু সে দিকে মোটেই দিইনি কান। তারপর থেকে সবখানেই ঐ পাখিদের ডাক শুনতে পেতাম: গ্রামের ধারে ও জাতের পাখি অজস্র আছে বলে মনে হল।

প্রকাশকের কাছ থেকে আমার বইটা ফিরিয়ে এনে ও অঞ্চলের আরেকটা বাসা বাঁধা পাখির কথা তাতে ঢুকিয়ে দিতে হল।

সত্যিই, আমরা যা ভাবতে পারি না, তা দেখতে শুনতেও পাই না।

এই সাহায্যের জন্য আমার নাতনীকে ধন্যবাদ দিতে হয়। যা জানা তার প্রতি তার দৃষ্টি আমি খুলে দিয়েছিলাম, তার বদলে যা অজানা তার প্রতি আমার দৃষ্টি সে খুলে দিয়েছিল। সত্যিই 'বোবা পাখি'—আমি ত অসম্ভব মনে করেছিলাম।

তবুও, শেষ পর্যন্ত, আমার নাতনী—সেই শিশুটির কথাই ঠিক প্রমাণ হল।

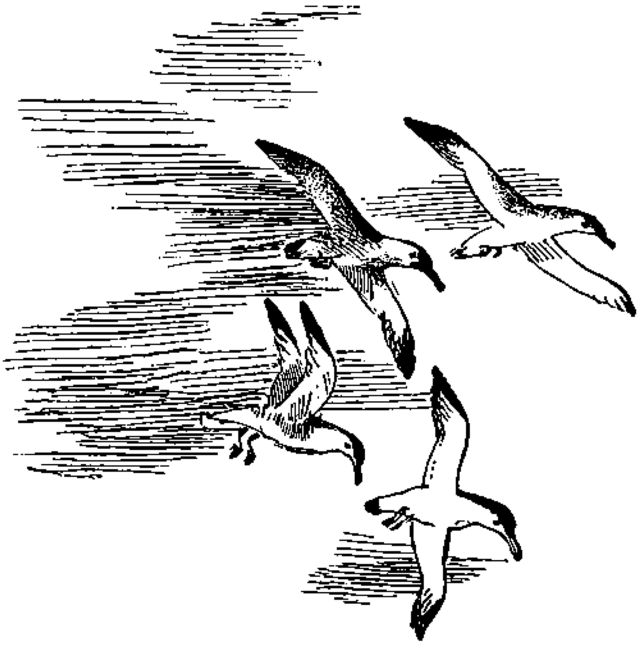

পরিশিষ্ট

গাংচিল

ছেলেবেলার স্বপ্নকে কখনও বিদ্রূপ কর না!

স্পেনদেশের প্রবাদ

একদিন ভোরবেলা, সবাই তখন সাগর তীরের এই স্বাস্থ্যনিবাসে ঘুমচ্ছে, একজন লোক সমুদ্রের তীরের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটির কপালের কাছের চুলগুলোয় পাক ধরেছে, চোখদুটি গভীর। ভাগ্যে বাতাস সেদিন শান্ত ছিল, নইলে লোকটির ঐ অবিন্যস্ত চুলের উপর তার চওড়া কানাৎ টুপীটা ধরে রাখা কঠিন হত।

লোকটি ছেলেবেলায় একবার এখানে গ্রীষ্মকালে এসেছিল। আজ আবার সে বহুদূর থেকে এখানে এসেছে, ছেলেবেলার স্মৃতিতে ঐ জায়গাটির কথা এত উজ্জ্বল হয়ে আছে যে তার আবার একবার দেখে যাবার সখ হয়েছে।

কিছুই আর আগের মত মনে হচ্ছে না। আগেকার সেই পাইন গাছ আর জেলেদের বিশ্রী চালাঘরের জায়গায় ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কুঁড়েঘর আর সুন্দর বাগান দেখা দিয়েছে। তবুও তার ছেলেবেলাকার সব স্মৃতি আবার ফিরে এল। তীরের দিকে তাকাতে তাকাতে নজরে পড়ল সেই জায়গাটি যেখানে তার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে স্নান করার সময় কত মাছ সে ধরেছে।

তার নিজের জীবন অবশ্য তারপর কত বদলে গেছে, তাকে আর চেনার উপায় নেই। আগে যখন এসেছিল তখন তার কেউ ছিল না, ভাগ্য তার প্রতি তখন মোটেই সদয় ছিল না। কিন্তু এখন?...

সমুদ্র ঠিক সেরকমই আছে। কেবল বালির চড়াগুলো সরে গেছে, তার উপরে সেই আগেরই মত গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে।

গাংচিলগুলো চেঁচাচ্ছিল।

লোকটি একটি খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে চোখ বুজে ফেলল।

গাংচিলের চীৎকার।

সঙ্গে সঙ্গে সে স্মৃতির রাজ্যে হারিয়ে গেল...

তীরের কাছাকাছি বালির চড়ায় কয়েকটা গাংচিল বসেছিল। পাখিগুলো তাদের শরীরটাকে এমনভাবে দিগন্তের সমান্তরালে রেখেছিল, মনে হচ্ছিল যেন সাঁতার কাটছে, মাথাটা কিন্তু খাড়া ছিল, ঠোঁটদুটো উপসাগরের তীর যেখানে অসীম সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, সেই দিকে ফেরান।

ছেলেটি তার অবিন্যস্ত চুলে ভরা মাথাটার ভার হাতের উপর রেখে, সোজা পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তীর থেকে জলের দিকে ঝুঁকে পড়া একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপরে পাইন গাছের তলে ছেলেটি শুয়েছিল। তার কালো, গভীর চোখদুটি চিন্তামগ্ন, যা কিছু দেখছে তাতেই বিস্মিত।

এখান থেকে দূরে তাকালে মনে হয় জগৎটাকে যেন আধখানা করে কেটে ফেলা হয়েছে, কেবল রয়েছে সমতল আর উত্তল; আর সেখানে সবকিছুই হয়ে উঠেছে অদ্ভুত আর অত্যাশ্চর্য।

গাংচিলের দিকে কেন তার চোখ পড়ছে, তা সে জানে না। সোনালী বালির চড়ার গায়ে তাদের সাটিনের মত সাদা পালকের চমকের জন্য কি? নাকি এই সুন্দর পাখিগুলো যে সব সময় তার মনে অস্পষ্ট স্বপ্ন, বর্ণনাতীত কামনা জাগিয়ে তোলে তার জন্য।

গাংচিলগুলো চুপ করেছিল একটুও নড়ছিল না, তার ওপর গলার টানটান খাড়া রেখায় তাদের বেশ ভারিক্কী, গুরুগম্ভীর মনে হচ্ছিল। তখন চারিদিকে ভরদুপুরের নিস্তব্ধতা, বিশ্রামের সময়, এ সময়ে একটি পাখিকেও সবুজ ঢেউয়ের উপরে পাক খেয়ে মাছ খুঁজতে দেখা যায় না।

বেশ গুমোট। গরমের তাপে বাতাসে ঢেউ উঠছে, কাঁপছে। সেই একঘেয়ে দৃশ্যে চোখ ক্লান্ত। ছোট ছোট মাথা নামান ঘুমন্ত ঢেউগুলো আলতোভাবে এসে বালির উপর পড়ছে। পাড়ে ভেসে আসা কাদা, সামুদ্রিক ফেনা আর সমুদ্রের ছোট ছোট ঘন ঝোপঝাড়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ছেলেটি গাংচিল দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে চোখদুটিকে লক্ষ্যহীনভাবে সবুজ, কাঁচের মত সমুদ্রের উপর দিয়ে চালিয়ে দিল।

তিনটে 'লাইবা' তাদের ধূসর পাল মেলে দিয়ে জলের বুকে নড়ছিল। তাদের পিছনে, আরও দূরে—খোলা পথে—একটা টানা-জাহাজ জোর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে তিনটে লম্বাটে গোছের বড় নৌকোকে টেনে আনছে, টানা-জাহাজ জলের গুবরে পোকার মত ঘোর কালো। একটা চ্যাপটা গোছের ছাই রঙা টর্পেডো-জাহাজ পিছনে ধুঁয়োর রেখা টেনে দিয়ে তাদের দিকে দৌড়ে আসছে।

ছেলেটির চোখদুটি জ্বলে উঠল। টর্পেডো-জাহাজের গতি সে এক মুহূর্তের জন্য উত্তেজিতভাবে লক্ষ্য করল, তারপর হতাশভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ ফিরিয়ে নিল।

হঠাৎ একটা গাংচিল তার কালো পাড় সরু ডানা খাড়া করে, অদ্ভুতভাবে দুপা ফেলে চড়ার ধারের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর হাওয়ার উপর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে জলের উপর দিয়ে আকাশে উঠে গেল...

সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সবকটা সেই পাখিটার দিকে মাথা ঘুরিয়ে কর্কশ স্বরে ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল—প্রথমে দীর্ঘ স্বরে তারপর কাটা কাটা ছন্দে দ্রুত তালে।

গাংচিলদের জোর, তীব্র চীৎকার শুনে ছেলেটি কখনও অবিচলিত থাকতে পারে না।

একবার একটা সত্যিকারের সাগর পাড়ি দেওয়া জাহাজের—সেটা আবার যুদ্ধজাহাজ—ভিতরে ঢুকে দেখবার সুযোগ ছেলেটি করে নিয়েছিল। মোটর বোটে করে যখন জাহাজটার কাছে যাচ্ছিল ঢেউগুলো তখন ছলাৎ ছলাৎ করে মোটর বোটের একেবারে ভিতরে এসে পড়ছিল। যুদ্ধজাহাজটার উঁচু ইস্পাতের গায়ের উপরেও ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছিল,

কিন্তু জাহাজটা তাতে এতটুকুও নড়ছিল না। বেশ নিচে ঢেউয়ের উপরে আর অনেক উঁচুতে জাহাজের কামান আর মাস্তুলের উপরে গাংচিলগুলো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল। তীরে ফিরেও ছেলেটি তাদের তীব্র ডাক শুনতে পাচ্ছিল।

সমুদ্র থেকে দূরে, সহরে বসেও একেক সময় সে সেই ডাক শুনতে পায়। সে ডাক শুনলেই তার পেটের ভিতর কি রকম অদ্ভুত লাগতে থাকে, ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যায়, কোনও এক মহৎ, দুঃসাহসী অভিযানে।

সেই গাংচিলটা চড়ার উপর পাক খেয়ে, চড়া আর সমুদ্র তীরের মাঝখানের ছোট ঢেউয়ের উপর আন্দোলিত একটা কালো মত কিসের দিকে যেন উড়ে গেল।

হঠাৎ ছেলেটি উঠে বসল, বিস্ময়ে চোখদুটি তার বড় হয়ে গেছে।

কালো মত জিনিসটা থেকে থেকেই জলের উপরে ঠেলে ঠেলে উঠছে, তার কোণগুলো রোদে ঝকমক করছে।

ছেলেটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—একটা ট্রাংক ভেসে আসছে, কোণগুলো তামা দিয়ে ভাল করে মোড়া যাতে ভেঙে না যায়—সেই যুদ্ধজাহাজের এক খালাসী নিচের ডেকে যে ট্রাংকটাকে উল্টেপাল্টে দেখছিল, ঠিক সেটার মত।

গাংচিলটা নেমে এসে ঠ্যাং বাড়িয়ে বেশ আলতোভাবে ট্রাংকটার উপর বসে ডানা মুড়ে ফেলল।

আবার বালির চড়া থেকে তীব্র বেসুরো চীৎকার এল।

কিন্তু ছেলেটি তা আর শুনতে পেল না।

উত্তাল ঢেউ যেন কালো আকাশের তারাদের দোলনায় দোলাচ্ছে।

মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া জাহাজ চলেছে, একেবারে তল থেকে সর্বোচ্চ ডেক পর্যন্ত আলোয় প্লাবিত। কিন্তু তার দিকে এগিয়ে আসছে একটা ডাকাতে জাহাজ, কালো, অমঙ্গলের সংকেতে ভরা, আলোগুলো নেবান।

—পাকড়াও জাহাজটাকে। আক্রমণ কর।

খালাসীরা সবাই ধরা পড়ল; ক্যাপ্টেন হাত পা বাঁধা অবস্থায় তার ক্যাবিনের মেঝেয়

পড়ে রইল। যাত্রীরা সব জন দস্যুদের বন্দুক আর রিভলভারের মুখের সামনে হাত তুলে দাঁড়াল।

ডাকাতরা তাদের লুটের মাল এক ডেক থেকে আরেক ডেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সরু পাটাতনের কাছে এনে সেখান দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। পাটাতনটা তাদের পায়ের তলে ক্যাঁচকোঁচ করে দুলতে লাগল, বেঁকে যেতে লাগল।

একটা ডাকাতের পা হড়কে গেল। একটা মস্ত বোঝা শুদ্ধ সে দুটো জাহাজের মাঝ-খানে হাঁ করা কালো জলে পড়ে গেল। তার ঘাড়ে ছিল কোণে তামার পাত লাগান একটা ট্রাংক। ডাকাতটা প্রাণপণ চীৎকার করে উঠল, কিন্তু তার উত্তরে কেবল গালাগাল আর ধমকের বজ্রধ্বনি ভেসে এল: সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে সময় নষ্ট করা ডাকাতদের পক্ষে সম্ভব নয়— তারা তখন সোনাদানা, টাকাপয়সার ভার থেকে যাত্রীদের মুক্ত করতে ব্যস্ত।

ডাকাতে জাহাজটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেনের বাঁধন খোলা হল। যাত্রীরা ভয়ে আর দুর্যোগে অভিভূত। তাদের মধ্যে একজন কেবল তখনও রাগে গজরাচ্ছে।

লোকটি একটি ক্রোড়পতি আমেরিকান। তার অর্ধেক সম্পত্তি ছিল তার সেই অতি সাধারণ খালাসী-তোরঙ্গে — ইচ্ছে করেই ওরকম করা যাতে লোকের সন্দেহ না হয়।

অনেক পিছনে ছোট্ট ট্রাংকটা ভেসে চলেছে।

একবার বিরাট ঢেউয়ের মাথায় উঠে যায়, তারপরেই আবার দুই ঢেউয়ের মাঝখানের খাদে ডুবে যায়। দূর দিয়ে চলে যাওয়া জাহাজের দৃষ্টি তার দিকে পড়ে না। কেবল গাংচিল আর আল্‌বাট্রস্‌রা তার উপরে বসে বিশ্রাম করে, একটা উড়ুক্কু মাছ একবার জলে নামবার সময় ট্রাংকের তামা বাঁধা কোণে ধাক্কা খেয়ে প্রাণ হারাল।

এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগরে, এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে ট্রাংকটা ভেসে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে তীরে এসে ঠেকবে।

বাক্সটার ভিতরে বাইসনের ছাপ মারা সব কড়কড়ে নোট রয়েছে — যার মূল্য ১০,০০,০০,০০০ ডলার। রয়েছে হীরা জহরৎ, রুবি, চমৎকার মুক্তোর হার, আরও কত কী।

ছেলেটি কী পেয়েছে, তা সব খবরের কাগজে বেরিয়ে যাবে। টাকাটা সে আরও চমৎকার সব নতুন নতুন যুদ্ধ জাহাজ বানাবার জন্য পাঠিয়ে দেবে। তার পুরস্কার হিসেবে

সে একটা দ্রুতগতি ইয়ট্ পাবে মাঝিমাল্লা সমেত, তাতে করে সে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরিয়ে যাবে। সঙ্গে খুব বেগে গোলা ছুঁড়তে পারে এমন একটা কামান আর অনেক গোলাগুলি রাখবে,—যদি জলদস্যুদের হাতে পড়ে।

আরেকটা গাংচিল ট্রাংকটার উপরে পাক খেয়ে প্রথমটার পাশে এসে বসল।

অবশেষে, ট্রাংকের ভারে কাহিল অবস্থা লোকটা ফুলের দেশের তীরে ভেসে এল।

অপূর্বসুন্দর সব ফুলেরা তার চারদিকে দীর্ঘবৃন্তে দাঁড়িয়ে দুলছে। তাদের উপরে ছোট ছোট পাখি পাক খেতে লাগল; তাদের রামধনুরঙা পালক সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল, তাদের মধুর গানে আকাশ বাতাস মুখরিত। অদ্ভুত সব জন্তু ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে লোকটির কাছে এসে বিষণ্ণ, সদয় চোখে তার দিকে শান্ত কৌতূহলে তাকিয়ে রইল।

লোকটি একটা লম্বা ফুল তুলে নিল। ফুলটা কাপের মত গভীর, কানায় কানায় মিষ্টি রসে ভরা। লোকটি লোভীর মত সবটা রস খেয়ে নিয়ে ফুলটা ছুঁড়ে দেওয়া মাত্রই জন্তুগুলো তাদের ছোট ছোট থাবা বাড়িয়ে ফুলটা লুফে নিয়ে খেলতে সুরু করে দিল। জন্তুগুলোর থাবার আঙুল শিশুর আঙুলের মত নরম, পেলব।

সূর্য তখন অস্তাচলে। একঘণ্টা পার হল, আরও একঘণ্টা, কিন্তু সূর্য তখনও সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে।

লোকটা তখন হামাগুড়ি দিয়ে ট্রাংকটা টানতে টানতে পাহাড়ের কাছে পেঁৗছে গেছে।

একেবারে পাহাড়ের ধার পর্যন্ত গিয়ে সে নিচে তাকাল।

নিচে সমুদ্র বিছিয়ে রয়েছে, তার একদিকে একটা সংকীর্ণ তীরে লোকজন দেখা যাচ্ছে।

তারা সব জলের ধারে লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই এক সাজ—গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলা লম্বা সাদা আলখাল্লা। লম্বা হাতায় ঢাকা তাদের হাত শরীরের দুপাশে শক্ত করে ধরা। তাদের মাথার উপরে গাংচিলের দল পাক খাচ্ছে, আর ওরা প্রত্যেকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

মানুষ। তবে ত বেঁচে গেছি।

লোকটি পাহাড়ের মাথায় উঠে, সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

—ইয়ো-হো-হো। ইয়ো-হো-হো।

পুরো লম্বা লাইনটা তার দিকে মাথা ফেরাল, কিন্তু কেউ জায়গা ছেড়ে একটুও নড়ল না।

লোকটি হাতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মানুষ নয়, ওগুলো পাখি—পেঙ্গুইন, পেঙ্গুইন।

অনেকক্ষণ লোকটি মুখ নিচু করে পড়ে রইল। তারপর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে, খুব কষ্টের সঙ্গে ভারী ট্রাংকটা পাহাড়ের ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিল।

ট্রাংকটা জলে পড়ে আবার ভাসতে লাগল। ভাঁটার স্রোত ট্রাংকটাকে সমুদ্রের ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। তার দূর যাত্রায় গাংচিলরা সঙ্গী হিসেবে চলল।

লোকটি পাগলের মত যতক্ষণ না বড় বড় ঢেউয়ের আড়ালে ছোট্ট ট্রাংকটা অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল।

ট্রাংকের মধ্যে লোকটির ডায়েরী রয়েছে। তাতে এই অনন্ত সমৃদ্ধির দেশে কী করে আসতে হয় তা বলে দেওয়া হয়েছে। এই ফুলের দেশে সুগন্ধ ফুলের মধ্যে পাখিরা বাসা বাধে; জন্তুরা, তাদের শান্ত সুন্দর চোখ, মানুষের কাছে এসে তাদের লুকোচুরি খেলতে ডাকে।

যে ট্রাংকটাকে উদ্ধার করতে পারবে, সে মানুষের অপরিচিত এই দেশের সন্ধান পাবে। পৃথিবীতে যত ছোট ছেলেমেয়ে আছে সবাইকে সে ঐদেশে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে তারা জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে খেলবে, পাখির সঙ্গে গান গাইবে, ফুলের বুকে ঘুমবে। সেখানে তারা পুরো জাহাজ বাহিনী বানিয়ে নেবে, আর প্রায়ই এসে বাবামার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

জাহাজডুবি থেকে রক্ষা পাওয়া একমাত্র ব্যক্তি, সেই বিখ্যাত পর্যটক, হল ঐ দেশের আবিষ্কারক। যতদিন নিজের দেশে ফিরতে না পারছে ততদিন সে ফুল আর গাছের মূল খেয়েই বেঁচে থাকবে।

আরও একটা গাংচিল ট্রাংকটার কাছে উড়ে গেল।

কিন্তু বসার জায়গা না থাকায় পাখিটা ধীরে ধীরে তোরঙ্গটার উপরে পাক খেতে লাগল।

তোরঙ্গটা তখন একেবারে তীরের কাছে এসে গেছে। তার একটা ভাঙা তামা বাঁধান কোণ, কী কারণে যেন, অন্যগুলোর চেয়ে উঁচুতে জলের উপর মাথা তুলে রয়েছে, ছেলেটি তাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

ছেলেটি তখন অধৈর্য হয়ে পড়েছে। সমুদ্রের এই অপূর্ব উপহারটিকে ঢেউগুলো কখন আস্তে আস্তে ঠেলে এনে তীরে তুলবে, তার জন্য সে আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। স্বপ্নে আর সে সন্তুষ্ট নয়: ট্রাংকে তার জন্য কী আছে তা তাকে জানতেই হবে।

লাফিয়ে পাহাড়ের তলে নেমে গিয়ে জলের দিকে সে দৌড়তে লাগল। তার এই সশব্দ আবির্ভাবে গাংচিলদুটো তোরঙ্গ ছেড়ে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর তিনটেতে মিলে সমুদ্রের খোলা বুকের দিকে উড়ে গেল। তাদের সঙ্গী যারা বালির চড়ায় বসেছিল তারাও ভয় পেয়ে সবাই মিলে নিঃশব্দে আকাশে উঠে গিয়ে বড় বড় পাক খেয়ে একই দিকে উড়ে চলে গেল।

ছেলেটি কোমর জলে গিয়ে কম্পিত হাতে তোরঙ্গটার দুটো কোণ ধরে সেটাকে তীরে টেনে আনল।

দেখল তোরঙ্গটায় তালা পর্যন্ত নেই।

ডালা খোলার সময় তার বুকের স্পন্দনে প্রায় ব্যথা লাগতে লাগল।

তোরঙ্গটা একেবারেই ফাঁকা।

ভাগ্যের এ কি কৌতুক।

কিন্তু ডালার অন্য ধারে সে নিজেকে দেখতে পেল: ডালায় লাগান ছোট্ট আয়নাটার ঠাণ্ডা গায়ে তার গভীর, তপ্ত, বিস্মিত চোখের ছায়া, সে চোখে স্বপ্নমাখা ছায়া পড়েছে তার গোলাপী মুখের আর তার মাথার উপরের বিরক্তিকর ছেলেমানুষী ঝুঁটির।

আর দূর থেকে, সমুদ্রের মেলে দেওয়া বুক থেকে শ্বেত পাখিদের ডাক ভেসে আসছে, জলের বিরাট বিস্তৃতির পাখিদের ডাক।

বিদ্রূপের হাসির মত তার আওয়াজ।

লোকটি চোখ খুলল।

সত্যি, ঠিক এইখানেই ছেলেবেলায় সে সমুদ্রের কাছ থেকে একটা ছোট্ট সাগর তোরঙ্গ উপহার পেয়েছিল।

এখনও সেই উপহার সে দুর্মূল্য রত্নের মত যত্ন করে রেখে দিয়েছে।

সে ঠিক করে রেখেছিল তার কবিতার প্রত্যেকটি নতুন সংস্করণের একটি সংখ্যা এই অমূল্য তোরঙ্গে রাখবে। এখন তোরঙ্গটা সম্পূর্ণ ভরে গেছে।

এই পৃথিবীর উদার ব্যাপ্তি সে তার স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে দিতে পেরেছে, জীবনের গোপন কথা তার মোহন সুন্দর কবিতায় পূর্ণ করে দিতে পেরেছে।

এখনও যখন সে বাক্সের ডালাটা খোলে, আয়নাটায় আগের মতই সেই এক মুখ, সেই সমান বিস্ময়মুগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টির ছায়া পড়ে, কেবল বয়সটা চল্লিশ বছর বেড়ে গেছে।

এ ছাড়া আরো কিছুও সে দেখতে পায়: আরও অনেক লোকের মুখ তার দিকে ভালবাসার সঙ্গে কৃতজ্ঞ, সদয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জীবনের দীর্ঘ পথে যারা তার হাসি অশ্রুর অংশ গ্রহণ করেছে, যাদের কথা নিয়ে সে বই লিখেছে, যাদের উদ্দেশ করে তার সবচেয়ে প্রিয় কথা, অমূল্য কথা সে বলেছে, তাদেরই মুখ। তারা কেউ চেনা, কেউ অচেনা—তার অন্তরের শ্রেষ্ঠ ধন সে এদেরই দিয়েছে যাতে তাদের জীবন আরও ভাল, আরও সমৃদ্ধ হতে পারে। জীবনের বিস্ময়কর গোপন কথা, আর তার স্বাদ ও অভিজ্ঞতা হল তার আধখানা। সেই ছোট বড়—সবরকম অভিজ্ঞতা আর আবিষ্কার সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াতেই পূর্ণতা। এতেই ত জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ।

সমুদ্র যে তোরঙ্গ তাকে উপহার দিয়েছে তার কথা মনে করে কবি আজ ভাবে: 'উপহারটা মোটেই বাজে নয়। জীবনে এর চেয়ে ভাল কিছু কখনও পাইনি।'

গাংচিলগুলো তখনও দূর থেকে তাকে বিদ্রূপ করে চলেছে।

তাদের ডাক শুনে কবির চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, নিজের উদ্দেশে, সারা পৃথিবীর উদ্দেশে চীৎকার করে বলে উঠল:

—এ মোটেই ঠাট্টা নয়। এ হল তীব্র, প্রবল শঙ্খধ্বনি। সমুদ্র ও আকাশের বিরাট ব্যাপ্তিকে এই ডাক ভরে দিয়েছে, তা না হলে সব মনে হত শূন্য।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে
আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।
অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা :

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১ জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
Foreign Languages Publishing House
21 Zubovsky boulevard
Moscow, Soviet Union

ВИТАЛИЙ БИАНКИ
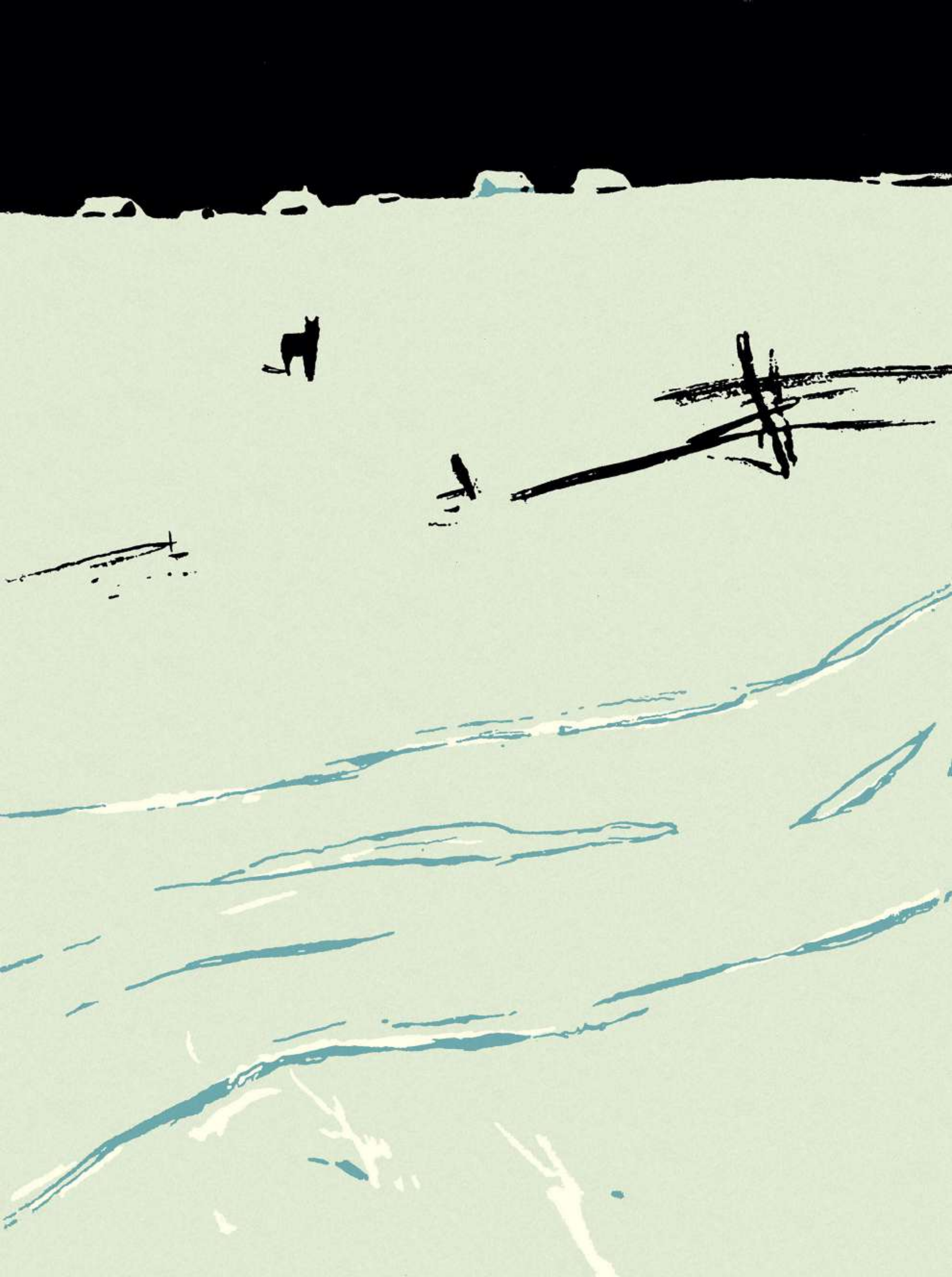
НЕЧАЯННЫЕ ВСТРЕЧИ